পরিচয়

মাঘ ১৩৬৮

বিমল চক্রবর্তী
অসীম রায়
চিন্ময় গুহঠাকুরতা
বীরেন্দ্রনাথ সরকার
কার্তিক লাহিড়ী
রেজ্যায়েও ক্লীমেন্ট যোহিন
অমল হালদার
অমল দাশগুপ্ত
নেপাল মজুমদার
সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়
রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত
চিত্তরঞ্জন ঘোষ
জ্যোতির্ময় বসু
অজিত গঙ্গোপাধ্যায়
বার্ণিক রায়
প্রদ্যোৎ গুহ
দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদক

গোপাল হালদার । মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

মাঘ **সূচীপত্র** ১৩৬৮

সম্পাদক
গোপাল হালদার । মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

সত্য গুপ্ত কর্তৃক গণশক্তি প্রিণ্টার্স (প্রাঃ) লিঃ, ৩৩ আলিমুদ্দিন স্ট্রীট থেকে মুদ্রিত ও ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত।

পাঠকদের প্রতি নিবেদন

আগামী সংখ্যা থেকে 'পরিচয়'-এর কলেবর ও বিন্যাস নবতর করার একটি দীর্ঘ পরিকল্পনা কার্যকর হবে। বলা বাহুল্য সেই সঙ্গে বিষয়বস্তুর পরিবেশনাতেও ব্যাপকতা এবং উৎকর্ষ আসবে।

'পরিচয়'-এর যে-সমস্ত পাঠক এই পত্রিকার গত ত্রিশ বছরের ইতিহাস জানেন, তাঁদের কাছে এটি নিশ্চয়ই খুব একটা আনকোরা খবর হবে না। কারণ এই সময়কালে 'পরিচয়' আরো অনেকবারই রূপান্তরিত হয়েছে। তবে এবারকার রূপান্তরের প্রয়াসটি এমন এক বয়েসে, যখন বাংলাদেশের সাধারণ হিসেবে এই পত্রিকার নিজস্ব একটি সীমানাবৃত্তে স্থিতি লাভ করা উচিত ছিল। সুতরাং পুরনো পাঠকরাও নিশ্চয়ই এই ভেবে খুশি হবেন যে 'পরিচয়'-এর যাত্রারম্ভের দুর্মদ তারুণ্য ত্রিশ বছরেও নিঃশেষ হয় নি।

একদিকে দেশবাসীর মনে ব্যাপ্ত ও বিপুল সাংস্কৃতিক অন্বেষা, অন্যদিকে সংস্কৃতিজগতে প্রতিক্রিয়াপন্থীদের ষড়যন্ত্রে সৃষ্ট ক্রমবর্ধমান নৈরাজ্য—বিকাশ ও বিনাশের এই পরস্পর বিরোধী দ্বন্দ্বের সামনে 'পরিচয়' আরও একবার নতুন করে তার ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনে তৎপর হল।

আমরা চাই 'পরিচয়' ব্যাপ্ত হোক, প্রসারিত হোক, সর্বস্তরের বুদ্ধিজীবীর মনকে স্পর্শ করুক। আবার সেই সঙ্গে ভ্রান্তি ও পশ্চাৎপদতার স্বরূপ উন্মোচিত করে 'পরিচয়' যা সত্য, যা সুন্দর, যা অগ্রগামী—তাকে প্রতিষ্ঠা দিক। তাই একই সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্বালোচনা ও সহজবোধ্য নিবন্ধ প্রকাশে আমরা স্থির সঙ্কল্প। আর সেই সঙ্গে মৌলিক শিল্পসৃষ্টির বিচিত্র ও যথার্থ প্রকাশের নমুনাও 'পরিচয়' নিয়মিত বহন করবে। বিশ্বসাহিত্য ও বিশ্বসংস্কৃতির সঙ্গে পাঠক-সাধারণের পরিচিতি সাধনের উদ্দেশ্যেই একদা 'পরিচয়' পত্রিকার আবির্ভাব ঘটেছিল। দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর বিকাশমান সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে দেশবাসীর আত্মীয়তা স্থাপনে 'পরিচয়' ছিল অনলস। আজও আমরা আমাদের সেই মহান্ ঐতিহ্যের প্রতি অবিচল থাকব।

সভ্যতার এই সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে অনলস সৃষ্টি ও অনির্বাণ সংগ্রাম—এই দ্বৈত ভূমিকা পালনে 'পরিচয়' নতুন করে অঙ্গীকার নিল। লক্ষণীয় যে-সব পরিবর্তন ফাল্গুন সংখ্যা থেকেই পাঠকদের চোখে পড়বে, তা হচ্ছে বহিরঙ্গের দিক থেকে পত্রিকার পৃষ্ঠা সংখ্যাবৃদ্ধি ও কাগজের সর্বাঙ্গীন উৎকর্ষ এবং অন্তর্বস্তুর বিচারে বিপুলতর ও বিচিত্রতর দিগন্তে পদচারণা। এবং সেই সঙ্গে মূল্যবৃদ্ধি।

সাধ্যমতো পাঠক ও পত্রিকা বিক্রেতাদের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করে তবেই আমরা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

'পরিচয়' বর্তমানে ছাপা হয় নিউজপ্রিন্ট-এ। বিজ্ঞাপনসহ গড়ে ছ ফর্মা অর্থাৎ ছিয়ানব্বই পৃষ্ঠা থাকে। সূচীপত্র, বিজ্ঞাপন প্রভৃতি বাদে গড়ে পঁচাশি থেকে নব্বই পৃষ্ঠা পাঠ্যবস্তু থাকে। তাছাড়া পত্রিকাটি চিত্রশোভনও করা যায় না। বলতে দ্বিধা নেই নিছক পাঠকদের সহৃদয়তা ও পত্রিকার বিশেষ ভূমিকা এবং প্রকাশিত রচনার বিষয়গত মহিমায় 'পরিচয়' এই চেহারায়ও এতদিন প্রকাশিত হতে পেরেছে।

কিন্তু আজ 'পরিচয়'-এর এই দরিদ্র চেহারা পাল্টানো দরকার। তাই আমরা স্থির করেছি এখন থেকে 'পরিচয়' নিয়মিতভাবে এ্যান্টিক কাগজে ছাপা হবে। পঁচাশি থেকে নব্বুই পৃষ্ঠার স্থলে অন্তত একশো আঠাশ (এবং সম্ভব হলে অদূর ভবিষ্যতে দেড়শো) পৃষ্ঠার পাঠ্যবস্তু থাকবে। প্রচ্ছদটি পাল্টানো হবে। প্রতি সংখ্যায় অন্তত একটি চিত্রের প্রতিলিপি প্রকাশের চেষ্টা করা হবে।

ফলে আমাদের প্রকাশন-ব্যয় প্রায় দ্বিগুণ হবে। সেই তুলনায় আমাদের বিজ্ঞাপনভাগ্য দুর্বল। পঁচিশ ন.প. মূল্য বৃদ্ধি করেও প্রতি সংখ্যায় আমাদের যথেষ্ট ঘাটতি যাবে যদি না পূর্বের মতো পাঠকরা নিজেদের উদ্যোগে 'পরিচয়'-কে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন। আরও অন্তত পাঁচ হাজার গ্রাহক না হলে আমাদের পক্ষে এই নতুন ও গুরুভার দায়িত্ব পালন দুঃসাধ্য হবে।

আমাদের অতীত অভিজ্ঞতা থেকেই আমরা 'পরিচয়'-এর শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি বিশ্বাস অর্পণ করে এই রূপান্তরের প্রয়াসে হাত দিতে পেরেছি।

আশা করি 'পরিচয়' তার এই নতুন পদক্ষেপে পাঠক সাধারণের ঐকান্তিক সহানুভূতি ও শুভেচ্ছা লাভের ভিতর দিয়ে তার যা কিছু সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে উঠে বাংলার সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তার মহান্ ঐতিহ্যকে অক্ষুণ্ণ রাখতে সমর্থ হবে।

—সম্পাদক

পরিচয়
বর্ষ ৩১। সংখ্যা ৭
মাঘ। ১৩৬৮

পশ্চিম বাঙলার অর্থনীতি ও বেকারসমস্যা

বিমল চক্রবর্তী

পশ্চিম বাঙলার সরকারী মহল থেকে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করা হয় যে বাঙলা দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা অন্যান্য রাজ্যগুলি থেকে মোটেই খারাপ নয়। কিন্তু বাঙলাদেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক চরিত্র বিশ্লেষণ না করে নিছক একটি দিকে দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত করলেও আমরা এই সরকারী উচ্চকণ্ঠের জবাব পাই। যেমন ধরা যাক, বেকার সমস্যা। ২১-৭-৬১ তারিখে বিধান সভায় আমাদের শ্রমমন্ত্রী জনাব আবদুস সাত্তার সাহেব বলেছেন যে বাঙলায় বেকারের সংখ্যা ১১ লক্ষ ৭৬ হাজার এবং শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা তার মধ্যে হল ২ লক্ষ ১৯ হাজার। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত দেশবাসীর অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্য অন্যপ্রকার। তাছাড়া এমনকি সরকারী পরিসংখ্যানও মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়ের উক্তি যে ভ্রান্ত, তা-ই প্রমাণ করে।

বেকার সমস্যার পরিমাণ ও প্রকৃতি

বেকার সমস্যার পরিমাণ ও প্রকৃতি নির্ণয়ে বেসরকারীভাবে চেষ্টা করেছেন শ্রীযামিনীরঞ্জন দাস তাঁর 'বাংলার বেকার সমস্যা ও তার প্রতিকার' বইটিতে। তাঁর মতে: "১৯৫৭ সালের পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় বাংলায় বেকার সংখ্যা বার লক্ষ এবং প্রতি বৎসর দুই লক্ষ হারে তা বাড়ছে," ..."কর্মক্ষম নারী ও পুরুষ বেকারের প্রকৃত সংখ্যা বেসরকারী হিসাবে এবং যা কিছুটা নির্ভরযোগ্য বলেই মনে হয়—কুড়ি লক্ষেরও উপর। আর প্রতি বৎসর এই সংখ্যা অন্তত তিন লক্ষ হারে বাড়ছে (ঐ, পৃঃ ২)। যামিনীবাবু কোথা থেকে ঐ তথ্য পেলেন তা আমরা তাঁর বইটি থেকে জানতে পারি না। কিন্তু

যামিনীবাবুর বইটি ছাড়া কয়েকটি সরকারী রিপোর্ট আলোচনা করলেই আমরা বাঙলাদেশের বেকার সমস্যা, তার প্রকৃতি এবং পশ্চিম বাঙলার এক ভয়াবহ অর্থনৈতিক চিত্র সম্পর্কে অবহিত হই।

পশ্চিম বাঙলার সহরাঞ্চলে ১৬—৬০ বৎসর বয়সের মধ্যে কর্মক্ষম ব্যক্তির সংখ্যা হল ৪২৮৫৯০০ জন, তাদের মধ্যে সারা বৎসর কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তির সংখ্যা হল ২০১৭৪০০ জন অর্থাৎ সহরাঞ্চলে সারা বৎসরে পূর্ণ বেকার ও অর্ধবেকারের সংখ্যা দাঁড়াচ্ছে ২২ লক্ষ ৬৯ হাজার ৫ শত জন। গ্রামাঞ্চলে পূর্ণ বেকার ও অর্ধবেকারের সংখ্যা হল ১৭ লক্ষ ২৭ হাজার ৪ শত জন। অর্থাৎ বাঙলাদেশে মোট পূর্ণ ও অর্ধবেকার অথচ কর্মক্ষম লোকের সংখ্যা হল : ৩৯ লক্ষ ৯৬ হাজার ৯ শত জন [১]। অবশ্য এই সংখ্যার পুরোটাই বেকার ধরা উচিত হবে না কারণ যে রিপোর্ট থেকে আমরা এই তথ্যগুলি ব্যবহার করছি তাতেই বলা হয়েছে যে ওই সংখ্যাতে কর্মক্ষম অথচ কাজ করতে ইচ্ছুক নন এমন সংখ্যাও ধরা হয়েছে। আমরা তাহলে মোটামুটিভাবে ৩০ লক্ষ লোককে বেকার ও অর্ধবেকার বলে চিহ্নিত করতে পারি। আর যদি আমরা বার্ষিক বৃদ্ধির হার সম্পর্কে জানতে চাই তাহলে আমাদের এম্পলয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের তথ্যের দিকে নজর দিতে হবে :

১৯৫৯ সালে রেজিস্ট্রিকৃত বেকার সংখ্যা ছিল ২ লক্ষ ১৪ হাজার ৭৫ জন, বছরের শেষে রেজিস্ট্রিকৃত বেকার সংখ্যা ছিল ২ লক্ষ ২০ হাজার ২ শত ১৮ জন। ১৯৬০ সালে নভেম্বর মাস পর্যন্ত বেকার সংখ্যা হল ২ লক্ষ ৮৩ হাজার ৪ শত ৪২ জন [২]। গ্রামাঞ্চলের হিসাব নিয়ে এবং অ-রেজিস্ট্রিকৃত বেকার সংখ্যা ধরলে বার্ষিক বৃদ্ধির হার ৪ লক্ষেরও উপর অনুমান করতে হয়।

শতকরা হিসাবে বলা যায় যে কলিকাতায় কর্মে নিযুক্ত লোক সংখ্যার অনুপাতে বেকার ও কর্মপ্রার্থীর পরিমাণ হল শতকরা ২১·৪ ভাগ। সমস্ত সহরাঞ্চলের ওই হিসাবটি হল শতকরা ১৮·৪ ভাগ এবং গ্রামাঞ্চলে (নদীয়া ও ২৪ পরগণা) হল শতকরা ৭·১ ভাগ [৩]।

বেকার সমস্যার প্রকৃতি প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে শহরে এবং গ্রামে (নদীয়া এবং ২৪ পরগণা) বেকার ও কর্মপ্রার্থীদের শতকরা ৫০ ভাগেরও বেশি হল ১৬-২০ এবং ২১-২৫ বৎসর বয়োক্রমের ভিতর [৪]। বর্তমান কালের যুবকশ্রেণীর হতাশাবোধের কারণ অতি সহজেই ব্যাখ্যা করা যায়। আবার গ্রামাঞ্চল

থেকে সহরাঞ্চলে শিক্ষিত বেকার ও কর্মপ্রার্থীদের সংখ্যা বেশি। সহরাঞ্চলের কর্মপ্রার্থীদের ৬ ভাগের ১ ভাগ হচ্ছেন অশিক্ষিত (গ্রামাঞ্চলে অর্ধেক অর্থাৎ শতকরা ৫০ জন); সহরাঞ্চলে কর্মপ্রার্থীদের শতকরা ২০ ভাগের শিক্ষার মান হল ম্যাট্রিক ক্লাস থেকে বি. এ. পাস পর্যন্ত [৫]। কলিকাতাতেই উদ্বাস্তু বেকার ও কর্মপ্রার্থীদের চাপ সর্বাধিক। আবার গ্রামাঞ্চলে ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভিতর বেকার সংখ্যা ভয়াবহ। সহরাঞ্চলে স্ত্রীলোক বেকার ও কর্মপ্রার্থীর সংখ্যাও বিরাট, প্রায় ৫৭ হাজার কর্মপ্রার্থী এই শ্রেণীভুক্ত [৬]।

অনেকের ধারণা বাঙলাদেশের বেকারীর কারণ হচ্ছে অবাঙ্গালী জনসমাজ কর্তৃক বাঙলা শোষণ। একথা ঠিক আমাদের রাজ্য-আয়ের একটি বড় অংশ অন্যান্য রাজ্যগুলিতে বেসরকারীভাবে হস্তান্তরিত হয় [৭]। কিন্তু সেই অবাঙালী জনসমষ্টির ভিতর বেকারীর চাপ কিছু মাত্র কম নয়। বাঙলাদেশে অবাঙালী জনসমষ্টির তুলনায় অবাঙালী বেকারের অনুপাত হল শতকরা ৫·৯৬ ভাগ আর বাঙালী বেকারের অনুপাত হল শতকরা ৭·৯৬ ভাগ।

যদিও আগে উল্লেখ করা হয়েছে যে শহরাঞ্চলে কর্মক্ষম লোকের শতকরা ১৮ ভাগ এবং গ্রামাঞ্চলে শতকরা ৭·১ ভাগ লোক বেকার, কিন্তু এই তথ্যটিও গ্রামাঞ্চলের সমস্যা সম্পর্কে যথেষ্ট আলোকপাত করে না। সরকারী পরিসংখ্যানে [৮] যে দুটি জেলা প্রসঙ্গে তথ্য দেওয়া হয়েছে তাকে যদি বাংলাদেশের সামগ্রিক তথ্য হিসাবে ব্যবহার করা যায়, তবে বলা যেতে পারে যে বাঙলাদেশের শতকরা মাত্র ৪৮·৫৫ ভাগ চাষী সারা বৎসর চাষে নিযুক্ত থাকেন অথচ চাষবাস করেন এমন জনসংখ্যার পরিমাণ হল শতকরা ৮১·০৯ ভাগ। শতকরা ১৪·১৯ ভাগ চাষী বছরে চাষের কাজে নিযুক্ত থাকেন ৫-৬ মাস পর্যন্ত, শতকরা ১২·৭০ ভাগ চাষী ৭-৮ মাস পর্যন্ত এবং শতকরা ২৪·৯২ ভাগ চাষী ৯-১০ মাসের জন্য। এর একটা বিরাট অংশ বৎসরে চাষের কাজের পর বাকি সময়ে বেকার থেকে যায় (সমগ্র গ্রামাঞ্চলের জন সংখ্যার প্রায় ৩৩ ভাগ)। কাজেই গ্রামাঞ্চলে অধবেকারী ও পূর্ণবেকারীর সমস্যা সহরাঞ্চলের বেকারীর সমস্যা থেকে কম ভয়াবহ নয়।

বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

আমরা যে তথ্যগুলি উল্লেখ করেছি তা সরকারের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ করা যায় এই মর্মে যে Final Report…of Survey of unemployment—19_3

—এই রিপোর্টটির তথ্য ১৯৫৩ সাল সম্পর্কে। ইতিমধ্যে দুটি পরিকল্পনা শেষ হয়ে গেছে ; অতএব আগের চিত্র বর্তমানের "পরিবর্তিত" পরিপ্রেক্ষিতে খাটে না। কিন্তু আমরা একটু পরেই সরকারী তথ্য থেকেই দেখাবার চেষ্টা করব যে বর্তমানে অবস্থার তো উন্নতি হয়ই নি বরং আরও অবনতি হয়েছে।

অফিসের চাকুরীর ক্ষেত্রে সরকারী চাকুরীর স্থান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, ১৯৫০ সাল থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত এই নয় বৎসরে সরকারী চাকুরীর পরিমাণ বেড়েছে মাত্র ৭৩ হাজার ৮৩২টি এবং তারও বেশির ভাগ হল অস্থায়ী চাকুরীর ক্ষেত্রে। ১৯৫৮ সালে সরকার যে অফিসের চাকুরী দিয়েছেন তার ৪৮·৩ ভাগ হল অস্থায়ী [৯]। আবার পশ্চিমবঙ্গের রেজিস্ট্রিকৃত কারখানায় দৈনিক কর্মে নিযুক্ত গড় শ্রমিক সংখ্যাও আরেকটি চাঞ্চল্যকর তথ্য উদ্‌ঘাটিত করে। ১৯৫০ সালের তুলনায় ১৯৫৮ সালে এই নয় বৎসরে ওই সংখ্যাটি বেড়েছে মাত্র ৩০ হাজারের কাছাকাছি ; এবং আরেকটি লক্ষণীয় বিষয় হল, ওই সময়ের ভেতর সরকারী ও আধা সরকারী শিল্পসংস্থায় দৈনিক নিযুক্ত শ্রমিক সংখ্যা কমে গেছে [১০] ; আর এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার, ওই নয় বৎসর হল প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার "সাফল্যকাল" এবং "বৈপ্লবিক শিল্প-প্রগতিমূলক কর্মসূচী"—দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রায় অর্ধেক সময়।

বিভিন্ন জেলায় দৈনিক নিযুক্ত গড় শ্রমিক-সংখ্যায়ও ওই নয় বৎসরের ভেতর বিশেষ কিছু পরিবর্তন হয় নি। বর্ধমান জেলায় ওই সংখ্যাটি বেড়েছে প্রায় সাড়ে তের হাজার এবং কলিকাতা সমেত প্রায় অন্যান্য জেলায় ওই সংখ্যাটির বিশেষ পরিবর্তন হয় নি, কিন্তু ২৪ পরগণায় আসলে ওই সংখ্যা এই নয় বৎসরে কমে গেছে [১১]। এই প্রসঙ্গে আরেকটি উল্লেখযোগ্য তথ্য হল পশ্চিম বাঙলার সরকারী ও বেসরকারী শিল্প সংস্থায় ১৯৫৫-৫৭ সালে গড়ে বার্ষিক মজুরীর প্রায় কোনোই পরিবর্তন হয় নি [১২]। আবার ১৯৬০ সালে নভেম্বর পর্যন্ত পশ্চিম বাঙলার এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে যে ২ লক্ষ ৮৩ হাজার ৪৪২ জন বেকারের নাম উঠেছিল তার ভেতর চাকুরী পেয়েছে মাত্র ১৪ হাজার ৩২৮ জন [১৩]।

অতএব বাকি থাকে কৃষি এবং ক্ষুদ্র শিল্প। ১৯৫১-৫২ সালে ক্ষুদ্র শিল্প পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য আয়ের শতকরা ৫·৮১ ভাগ উৎপন্ন করেছিল কিন্তু ১৯৫৫-৫৬ সালে রাজ্য আয়ের শতকরা ৫·৭৫ ভাগ এই বিভাগ থেকে পাওয়া গিয়েছিল [১৪]। পশ্চিম বঙ্গের রাজ্য আয় সংক্রান্ত প্রথম রিপোর্টটিতে উল্লেখ

করা হয়েছে যে জাতীয় আয়ের তুলনায় রাজ্য আয়ের বিরাট একটা অংশ যেমন আসছে খনি, বৃহৎ শিল্প, ব্যাঙ্কিং ও জীবনবীমা থেকে ঠিক তেমনি কৃষি, ছোট শিল্প প্রতিষ্ঠান ও বনসম্পদজাত ভারতীয় জাতীয় আয়ের তুলনায় বাঙলার রাজ্য আয় অত্যন্ত সামান্য। আবার প্রথমোক্ত তিনটি শ্রেণী থেকে শেষোক্ত তিনটি শ্রেণীতেই বাঙালীদের নিয়োগ সংখ্যা আপেক্ষিকভাবে অনেক বেশি। এর খুব সাধারণ অর্থ হল এই যে ভারতীয় যুক্তরাজ্যের 'সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ' গড়ার তাগিদে পশ্চিমবঙ্গ সরকার দেশী বিদেশী বৃহৎ শিল্পে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অনুপ্রেরণা দিয়েছেন অথচ ক্ষুদ্র শিল্প—যাতে বাঙালীরা বেশি পরিমাণে নিযুক্ত—বিভিন্ন অসুবিধার চাপে পড়ে দেশীয় অর্থনীতি থেকে উৎখাত হওয়ার উপক্রম হয়েছে। কৃষিতে যেখানে বাঙ্গালীর সংখ্যা বেশি সেখানকার অবস্থাও প্রায় অনুরূপ।

১৯৫১-৫২ সাল থেকে ১৯৫৫-৫৬ সাল পর্যন্ত এই কয় বৎসরে কৃষির উৎপাদন ২২৫·৩৭ কোটি টাকা (রাজ্য আয়ের শতকরা ৩১·০৯ ভাগ) থেকে ১৮২·৬১ কোটি টাকায় (রাজ্য আয়ের শতকরা ২৪·৩৮ ভাগ) এসে নেমেছে [১৫]। অর্থাৎ ভালো হওয়া তো দূরের কথা অর্থনৈতিক অবস্থা আরো অসহনীয় হয়ে উঠছে। কৃষিতে বাঙ্গালী জনসমষ্টির বিরাট অংশই নির্ভরশীল। তবুও ভারতের কৃষি থেকে গড় আয়ের তুলনায় বাঙলার কৃষি থেকে আয় অত্যন্ত কম। অর্থাৎ আমাদের কৃষিও ক্ষুদ্র শিল্পের মতোই ধ্বংসোন্মুখ এবং মুমূর্ষু। আমরা ১৯৫৫-৫৬ সাল পর্যন্ত পশ্চিম বাঙলার কৃষি ও ক্ষুদ্র শিল্পের অবস্থা দেখাবার চেষ্টা করেছি। এখন সরকারী মহল যদি উদ্দেশ্য প্রণোদিত-ভাবে অথবা সরকারী তথ্যই অবজ্ঞা করে উন্মাদের মতো যুক্তি দেখান যে ১৯৫৬ সাল থেকে অবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তন হয়ে গেছে, সেদিক থেকেও একটি তথ্য উল্লেখ করেই এই বিভাগের আলোচনা শেষ করা যায়। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে ১৯৫৯ সালে এবং ১৯৬০ সালে রেজিস্ট্রিকৃত বেকারের সংখ্যা অসম্ভব রকম বেড়ে গেছে (পাদটীকায় ২-এর উল্লিখিত পুস্তক)। রাজ্য পরিসংখ্যান সংস্থার রাজ্য-আয় সম্পর্কিত প্রথম রিপোর্টের উক্তিটিকে আমরা বর্তমানকালের বাঙলাদেশ সম্পর্কেও ব্যবহার করতে পারি : "It would appear therefore that although the total income of the state as a whole is higher than the Indian average,......the economic condition of the indegeneous population would in fact be much

worse than the average condition of the population of other states of India. The apparent prosperity of west Bengal is very misleading"[১৬]।

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য আয়

বেকার সমস্যা প্রসঙ্গে পশ্চিম বাঙলার রাজ্য আয়ের আলোচনা বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। রাজ্য পরিসংখ্যান ব্যুরোর রাজ্য আয় সংক্রান্ত প্রকাশিত দুটি রিপোর্ট অনুধাবন করলে সতর্ক ও বিবেকবান পাঠক নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বর্তমানে সংখ্যাতত্ত্বকে ভয় করতে আরম্ভ করেছেন। রাজ্য আয় সংক্রান্ত প্রথম রিপোর্টে বিশেষজ্ঞের রাজ্য-আয় সম্পর্কে আলোচনা ও মতামত সংযোজন করা হয়েছিল ; কিন্তু দ্বিতীয় রিপোর্টটিতে ওই ধরনের মারাত্মক মতামত খুব সচেতনভাবে সযত্নে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে, কারণ সত্যিকারের মতামত দিতে গেলে বর্তমান সরকারের এ-ক-বছরের ব্যর্থতার ছবি এত স্পষ্ট হয়ে উঠত যা প্রধান বিরোধী দল কমিউনিস্ট পার্টিও হয়তো সংসদে উপস্থাপিত করতে পারত না।

রাজ্য আয় সংক্রান্ত প্রথম রিপোর্টটিতে উল্লেখ করা হয়েছিল যে কৃষি, ক্ষুদ্র শিল্প এবং বন্য সম্পদে (সরকারী কাজ, ভৃত্যের কাজ এবং ডাক্তারী, ওকালতি প্রভৃতি সেবামূলক কাজ ছাড়া) বাঙালীরা অনেক বেশি পরিমাণে নির্ভরশীল ও কর্মে নিযুক্ত। আবার, বৃহৎশিল্প, খনির কাজ এবং ব্যাঙ্কিং ও ইনসিওরেন্সে অবাঙালীর আধিপত্য অনেক বেশি। প্রথম রিপোর্টে (অর্থাৎ ১৯৪৮-৪৯ থেকে ১৯৫১-৫২ সাল পর্যন্ত) বলা হয়েছে যে ভারতীয় আয়ের পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্য আয়ের "proportion appears to be particularly high in the sectors of Mining, Large Industry and Banking and Insurance. The proportion, is, however very low in the sectors of Agriculture, Small Industry and Forestry"[১৭]।

১৯৫১-৫২ সাল থেকে ১৯৫৫-৫৬ সাল পর্যন্ত রাজ্য আয়ের শতকরা হিসাবে কৃষি মারাত্মক অবনতির নজির তুলে ধরছে। ১৯৫১-৫২ সালে রাজ্য আয়ের শতকরা ৩৭'৯৭ ভাগ এসেছিল কৃষি, পশুপালন এবং চা শিল্প থেকে, কিন্তু ওই খাতে ১৯৫৫-৫৬ সালে আয় উৎপন্ন হয়েছে রাজ্য আয়ের শতকরা ৩০'৪৬ ভাগ। এই রিপোর্টটিতে বলা হয়েছে যে কৃষির ভাগে আয় কম পড়ার অন্যতম প্রধান

কারণ হল কৃষিজ উৎপন্নের দামের অবনতি। কারণ ১৯৫১-৫২ সালের দামের পরিপ্রেক্ষিতে দেখানো যায় যে কৃষি ও উল্লিখিত বিভাগগুলি থেকে ১৯৫১-৫২ সাল থেকে ১৯৫৫-৫৬ সালে ওই খাতে আয়ের পরিমাণ প্রায় ৩২ কোটি টাকার মতো বেড়ে গেছে। আবার ক্ষুদ্র শিল্প খাতে দেখা যাচ্ছে যে ১৯৫১-৫২ সালের তুলনায় ১৯৫৫-৫৬ সালে রাজ্য-আয়ের তুলনায় ক্ষুদ্র শিল্পখাতে আয় সামান্য কমে গেছে। বনসম্পদে যে আয় হয়েছিল তা ১৯৫১-২ সালের তুলনায় ১৯৫৫-৫৬ সালে খুব সামান্য বেড়ে গেছে। কিন্তু খনি, বৃহৎ শিল্প, ব্যাঙ্কিং এবং জীবন বীমা ও বৃহৎ ব্যবসায়ের প্রত্যেকটিতে ওই সময়ে আয়ের পরিমাণে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি ঘটেছে। এমন কি রাজ্য-আয়ের তুলনায় ওই সব বিভিন্ন খাতে শতকরা ভাগেরও বৃদ্ধি ঘটেছে[১৮]।

অথচ পশ্চিমবঙ্গে ১৯৪৮-৪৯ সাল থেকে ১৯৫৫-৫৬ পর্যন্ত এই আট বছরে রাজ্য আয় বেড়েছে শতকরা ১৭ ভাগ। এই সব তথ্য থেকে যে কথা স্পষ্ট হয়ে উঠছে তা হলো অবাঙালী ও পুঁজিপতিদের হাতে জমছে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে গড়া সমাজ ব্যবস্থায় অনুপ্রাণিত পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য আয়ের বাড়তি অংশ ; আর জনসাধারণ—চাষী, মজুর এবং মধ্যবিত্তশ্রেণী ক্রমশ নিঃস্ব হওয়ার মুখে। ১৯৫৫-৫৬ সালের পর জিনিষপত্রের দামের ক্রমাগত উর্ধ্বগতি, বাঙলার জনসমাজে ভয়ঙ্কর বেকার সমস্যা, পরোক্ষ কর-বৃদ্ধি এবং ঘাটতি বাজেট-জনিত মুদ্রাস্ফীতি—এই সব কারণগুলি আরো ভয়াবহভাবে রাজ্য আয়ের অসম বণ্টনে সাহায্য করেছে বলে অনুমান করে নিতে কষ্ট হয় না।

উপসংহার

তাহলে মোটামুটিভাবে বলা যায় যে, গত দশবৎসরে বাঙলাদেশে কি সহরে, কি গ্রামাঞ্চলে বেকার ও অর্ধবেকারের সংখ্যা অসম্ভব রকম বেড়ে গেছে, দু-দুটি পরিকল্পনায় কিছুমাত্র কর্মসংস্থান হয় নি বললেই চলে, যদিও সরকারী অফিসের চাকুরী কিছু বেড়েছে, তবুও "সুখী ও সোনার বাঙলা" গড়ার পরিকল্পনা শিল্প মাধ্যমে লোকের কর্মসংস্থান ঘটাতে পারে নি। এমন কি পশ্চিমবঙ্গের মাথা পিছু আয় ভারতীয় মাথা পিছু আয়ের থেকে ১৯৫৪-৫৫ সালে এবং ১৯৫৫-৫৬ সালে কম ছিল (১৯৫৫-৫৬ ভারতীয় মাথা পিছু আয় : পশ্চিমবঙ্গের মাথা পিছু আয়=৩০০ : ২৯৫)। আবার বর্তমান শাসনে মজুরী বাড়ে নি অথচ জিনিসপত্রের দাম ভীষণভাবে বেড়ে গেছে ; রাজ্য

আয়ের যেটুকু বৃদ্ধি ঘটেছে তাও গিয়ে জমেছে এদেশীয় এবং অবাঙালী বড়লোকদের হাতে। আর অবাঙালী বড়লোক শ্রেণীর হাত থেকে সেই আয় বেশ কিছু পরিমাণে (আনুমানিক, রাজ্য-আয়ের শতকরা ৩·৭ ভাগ—৭ নং পাদটীকা দ্রষ্টব্য) রাজ্যের বাইরে চলে গিয়ে রাজ্য-আয়ের পরিবর্ধন ঘটাতে পারেনি।

অথচ সবচেয়ে বড় সম্পদ আমাদের দেশে অপচিত হচ্ছে। আমাদের কি ভারতীয়, কি রাজ্য পরিকল্পনায় শ্রম-সম্পদকে কাজে লাগাবার কোনো সঠিক ও সম্পূর্ণ পরিকল্পনা নেই (অবশ্য না থাকাই স্বাভাবিক, কারণ সঠিক ও সম্পূর্ণভাবে শ্রম-সম্পদের ব্যবহার দেশের রাজনৈতিক-আর্থনীতিক কাঠামোর আমূল পরিবর্তনের পরিচায়ক)। কিন্তু শ্রমের ব্যবহার না করতে পারলে তা নষ্ট হয়ে যায়, অর্থাৎ বিনা ব্যবহারে শ্রম ধ্বংসশীল। রাজনৈতিক-আর্থনীতিক কাঠামোর আমূল পরিবর্তন না করেও বর্তমান কাঠামোতেও ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসার ঘটিয়ে, কৃষির আমূল সংস্কার করে, সমবায়ের মাধ্যমে বেকার সমস্যার সমাধান তথা জনসম্পদের অপচয় রোধ করা যায়। কিন্তু তাহলে যে বর্তমান শাসকগোষ্ঠীকে গোষ্ঠীচেতনার উর্ধ্বে উঠতে হয়, তা কি তারা পারবেন ?

১। Final Report and consolidated Summary of Survey of unemployment in W. Bengal—1953 (State Statistical Bureau, 1955).

২। Monthly Statistical Digest, West Bengal, Feb. 1961, পৃঃ ১৬।

৩। Final Report…of Survey of unemployment 1953, পৃঃ ৮।

৪। ঐ, পৃঃ ৭।

৫। ঐ, পৃঃ ৭।

৬। ঐ, পৃঃ ১১।

৭। State Income of West Bengal—1948-49 to 1951-52 (State Statistical Bureau) রিপোর্টে বলা হয়েছিল যে খনি, বৃহৎশিল্প, ব্যাঙ্কিং এবং বাণিজ্যবিভাগের আয় (এবং পরবর্তী State Income of West Bengal—1955-56 রিপোর্টে চা শিল্পকে আলাদাভাবে ধরা হয়েছে; আমাদের হিসাবে চা শিল্পকেও ধরা হয়েছে) অবাঙালী এবং অভারতীয়দের হাতেই প্রধানত জমা হয়। যদি অনুমান করা যায় যে ওই সব খাতের শতকরা ৮০ ভাগের মতো অংশ অবাঙালী এবং অভারতীয়দের হাতে জমা হয় ১৯৫৫-৫৬ সালে রাজ্য আয়ে অবাঙালীদের অংশ ছিল অন্তত ২৬১·৮৪ কোটি টাকা। Family Budget Enquiry in 24 towns of West Bengal including Calcutta—1955-56 (S. S. B.—1960) রিপোর্টটিতে দেখা যাচ্ছে যে অবাঙালীরা তাদের আয়ের শতকরা ১২ ভাগ রাজ্যের বাইরে পাঠায় (Table no. 22, পৃঃ ৩৯—৪১)। তাহলে দেখা যাবে যে ১৯৫৫-৫৬ সালে রাজ্য আয়ের (৮৪৩·৪৭ কোটি টাকা) শতকরা ৩·৭ ভাগ রাজ্যের বাইরে চলে যায়।

৮। Final Report…of Survey of unemployment—1953, পৃঃ ১৫।

৯। Statistical Abstract—W. Bengal, 1958, পৃঃ ২৮৭।

১০। ঐ, Table no, 21·1, পৃঃ ২৮৯-২৯৩।

১১। ঐ, পৃঃ ২৯৪।

১২। ঐ, পৃঃ ৩০৭।

১৩। Monthly statistical Digest, W. Bengal, Feb. 1961, পৃঃ ১৬।

১৪। State Income of W. Bengal, 1955-56, (State Statistical Bureau), Table no. 1·1, পৃঃ ২৭।

১৫। ঐ, ঐ।

১৬। State Income of W. Bengal—1948-49 to 51-52, পৃঃ ৪।

১৭। ঐ, পৃঃ ৩।

১৮। State Income of W. Bengal—1955-56 ; পৃঃ ২৭, Table no. 1·1 ; পৃঃ ৩১, Table no. 1·4।

ক বি তা গু চ্ছ

শান্তিনিকেতন ১৯৬১

অসীম রায়

এক

আন্দাজ করি সামনেই শিশু গাছ
কবিতায় তার যাতায়াত অব্যর্থ,
কিংবা অদূরে সাঁইথিয়াগামী ট্রেন,
বোগেনভিলার ফুটন্ত হাতছানি,
মাঠের ওপারে সাঁওতালদের গ্রাম
সেখানে আকাশ ভরেছে সূর্যোদয়।

ভালো লাগবার অনেক কিছুই আছে
অনুপস্থিত ভালো লাগবার মেজাজ,
অনুপস্থিত আমাদের চৈতন্যে
দিনগত পাপক্ষয়ের চেয়েও বড়
কোনো আগ্রহ, কোনো স্বপ্নই যখন
শূন্য তখনই স্বপ্ন দেখার সময়।

দুই

স্বপ্ন আসে উর্ধ্বশ্বাসে আঠারো বছরে
কিন্তু আটত্রিশে কিংবা আটান্নয়
তার দুটো ডানাই অকেজো,

পক্ষাঘাতগ্রস্ত দীন স্বপ্নের চেহারা
কী যে প্রহসন
সেই স্বপ্নের বালাই
ত্যাগ করে নির্মোহের শূন্য ছলনায়
কেউ মরে স্বজ্ঞান তিমিরে।

আমরা বাঁচি স্বপ্ন ও কর্মের
নির্মম নিয়ত দ্বন্দ্বে, দ্বন্দ্বে দিন কাটে ;
আশৈশব মৃত্যু ও অমৃত যে এত কাছাকাছি, এত
আতঙ্ক ও আনন্দের দ্বৈত সঙ্গীত
আমাদের জীবনের সর্বত্র বিস্তৃত
এতবার মৃত্যুর নিঃশ্বাস
আমাদে মুখে চোখে, এতবার
মোহিনী জীবন হাসে—
হে রবীন্দ্রনাথ তুমি দ্বৈতের অতীত ?
এ অমানুষিক
অপার্থিব নায়কের উত্তরীয় খুলে
মৃত্যু ও জীবনের সহজ সন্তান
আমাদের সহচর হও।

তিন

আশ্বিনেও মেঘের দামামা
জলে থৈ থৈ এ খোয়াই
ওপারে সূর্যাস্ত তার পৌরাণিক সৌন্দর্যে ঝলমল
উর্ধ্বলোকে পানকৌড়ি,

অকস্মাৎ ঢাক বাজে
বনের ওপারে কিংবা মনের এপারে
ঠিক বোঝা না গেলেও বোঝা যায়
যে দেহ বারে বারে আমাদের চৈতন্তে বিদেহী
যে সভায় পলাতক, বক্তৃতায় নীরব একান্ত
সে মলিন রেখা অবয়বে
রক্ত মাংস পেয়ে যায় ;
তারপর বাঁধের ওপরে
সাঁওতাল মেয়েরা হাঁটে
যেন তারা অর্ধনারীশ্বর
গতিতে আনন্দ, হাতে পায়ে গায়ে আনন্দ চমৎকার ;
হাওয়া দেয়, হাঁস ডাকে।

সেই অজ্ঞাত হাওয়া

চিন্ময় গুহঠাকুরতা

পশ্চাতে কাঁপে অবিসম্বাদী হাওয়া।
হায় ঈশ্বর, লুকিয়ে রেখেছ পুচ্ছ !
বর্ণে আঢ্য মহার্ঘ সাজসজ্জা
ফাল্গুনে যত কিশোরীর মুখে লজ্জা,
তোমার পতাকা সজোরে রেখেছ উচ্চ ;

হায় ঈশ্বর, অচেনা এ কোন হাওয়া ?

কৈশোরে তুমি ছিলে না চপলমতি
সরল বালক ভরা লাস্যে ও হাস্যে,
পশ্চিমে স্তুতি-নিন্দার নৈরাশ্যে
সম্প্রতি বায়ু সুতীব্র খরগতি ;
কাব্যের স্রোতে চড়া পড়ে টীকা-ভাষ্যে
হায় নির্বোধ, অন্তিমে আনো যতি !

সংস্কৃতিবান বৃদ্ধের সন্ত্রাস :
অচেনা হাওয়ার ঢেউ ভাঙে এই দেশে
কোনো বাধা নেই লজ্জার, শ্রদ্ধার
অধুনা ইহারা খাপখোলা তলোয়ার
মানসম্ভ্রম তিস্তায় গেছে ভেসে ;
(কিমাশ্চর্য ! সত্যই সেলুকাস···)

অথচ প্রবাসে পশ্চিমী মানুষেরা
শিক্ষাদীক্ষা নিদারুণ সংস্কৃত,
কলকাতা তবু চিরকাল ভীত, মৃত
দ্বিলোচন তবু কপট অন্ধ এরা ?
বেতার-বাণীতে স্পর্শকাতর লোকে
নেপথ্যে হাসে তির্যক কৌতুকে।

চতুর্দিকেই কালান্তরের হাওয়া—
অন্তর্যামী, লুকিয়ে রাখো হে পুচ্ছ।

আশ্বিনের দাবি

বীরেন্দ্রনাথ সরকার

দৃপ্ত ঘোড়া, বেগবান দিন
রাত্রি স্থির বিনিদ্র প্রহরী
প্রহরে প্রহরে কাঁপে ছায়া
ছায়ার আড়ালে এক রোদ
ভালোবাসার গভীর হৃদয় :
আশ্বিনে না, অঘ্রাণেই দেবো,
গাছের সবুজ পাতা কাঁপে।
উধাও মাঠের ধারে পথ, মাটির পথের ধারে তাঁবু
তাঁবুতে হাওয়ার বেগ, ঝড় ?
ভালোবাসার গভীর হৃদয় :
অঘ্রাণে না, ফাল্গুনেই দেবো।
লণ্ঠনের টিম-টিমে আলোয়
এ-ওর মুখের দিকে চায়
চারিদিকে অন্ধকার, অন্ধকারে বুটের আওয়াজ।

ওরা কারা ! চোখে যৌবন বসে আছে !
ভালোবাসার গভীর হৃদয়
বসে আছে প্রতীক্ষায়
কারখানার গেটে গেটে পাথরের শিখা
হুগলীর কারাগারে
ভালোবাসার গভীর হৃদয় বন্দী।

আশ্বিনে না, ফাল্গুনেই দেবো
ঘাসে ঘাসে পাতার মর্মরে তার প্রতিধ্বনি
মাঠে মাঠে জলের গভীরে সেই স্বর
ভালোবাসার গভীর হৃদয়
এত অন্ধকার! এত অন্ধকার, এত!
আদিগন্ত অন্ধকারে
সহস্র চোখের তারা জলে।

বন্দীনিবাস

কার্তিক লাহিড়ী

দূর থেকে শব্দ উঠে আসছে। শ্লথ, বিচ্ছিন্ন, অনিয়মিত, অ-সম-লয়—প্রায় অ-সৈনিকোচিত। অথচ যে দুজন কর্তব্যরত তাদের মাথায় লোহার টুপি, কাঁধে রাইফেল, পায়ে বুট-পট্টি, পরণে খাকি-পোষাক—রীতিমতো সশস্ত্র বাহিনীর সিপাই। আসছে কালীবাড়ির দিক থেকে স্টেশনের দিকে। স্টেশনের তে-মাথায় ডাক-বাংলোর সামনে পেট্রোল-পাম্প পর্যন্ত এসে একটু দাঁড়িয়ে এ-দিক ও-দিক চেয়ে হয়তো-বা কিছু কথা বলে, হয়তো-বা বিড়ি ধরিয়ে, হয়তো কিছু না বলে, চোখে চোখে নিজের কর্তব্য ঠিক করে ফিরবে এই রাস্তা ধরে কালীবাড়ির দিকে।

কালীবাড়ি থেকে স্টেশনের তে-মাথা। আবার তে-মাথা থেকে কালী-বাড়ি। খট্-খট্…খটা-খ্—

অথচ রাস্তা তখন ফাঁকা, মৃত। শুধু সৈনিক দুজনের ছায়া সামনে দীর্ঘ হয়ে হয়ে ছুট করে দেহের সঙ্গে মিশে গিয়েই পেছনে চলে যাচ্ছে। পেছনে আবার দীর্ঘতর হয়ে হয়ে নিমেষেই সামনে পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ছে, আবার লম্বা হচ্ছে। অর্থাৎ রাস্তায় আলো আছে, কিন্তু আশ-পাশের বাড়ির অথবা দোকানের আলো এসে পড়ছে না রাস্তায়। ভেতর থেকে যে-কোনো আলো আসা নিষেধ। তাই বন্ধ আছে জানলা, কপাট ; বন্ধ আছে আলোর অবাধ সঞ্চরণ।

শব্দ এগিয়ে আসছে। আর এ-ঘরে আলো নেই—তিনজন শুয়ে আছে বিছানায়। একজন বালিশ থেকে মাথা তুলে ডুবে গেল বালিশের অন্ধকারে। আর একজন উঠে বসে কিছু জিজ্ঞেস করতে চাইল একটা খিস্তি দিয়ে, কিন্তু কথা স্পষ্ট হলো না। চোখ বিঁধিয়ে দেখার চেষ্টা করল তৃতীয় জনকে। খানিকটা আন্দাজেই বুঝল, তৃতীয়জন ঘুমিয়ে পড়েছে। যে-বালিশের আঁধারে হারিয়ে গিয়েছিল খানিকটা আগে মুখ তুলেই তার দিকে তাকিয়ে বিরক্ত হলো। বিরক্তি হঠাৎ ম্যালেরিয়া জ্বরের কাঁপুনির মতো সারা শরীরে

ছড়িয়ে পড়তেই সুইচ টিপে দিলো আলোর। অন্ধকার ভেঙে খান্ খান্। চিন্ময় চোখ পিট্ পিট্ করে আলো সওয়াতে চাইল। কমল বালিশে মুখ গুঁজে থেকেই শব্দ করল "আঃ"। হর্ষ ঘুমিয়েই থাকল বাঁ পাশ ফিরে। চিন্ময় এবার উঠোনের মধ্য দিয়ে রান্নাঘরের দিকে দৃষ্টি পাঠাল। রান্নাঘর নিথর, নির্জন। হয়তো ভাত চড়েছে সবেমাত্র, অতএব চিন্ময় দ্বিগুণ বিরক্ত হয়ে আলো নিবিয়ে ধপ্ করে শুয়ে পড়ল। পাশের ঘরে একজন পড়ছিল টেবল-ল্যাম্পের আলোয়, দ্বিতীয়জন চৌকির ওপর জোড়াসন পেতে বসে মনে মনে হাসছিল। আর দুটি চৌকি ফাঁকা, লোক নেই। পড়ুয়া ছেলেটি পড়ছিল কবিতার বই। কিন্তু কিছুতেই ধারণায় আনতে পারছিল না কেমন করে "only by the form, the pattern,

Can words or music reach

The stillness,—"

কয়েকবার পংক্তি কটির অর্থ উদ্ধার করতে না পেরে বিরক্ত হয়ে সরিয়ে রাখল বই। তাকাল বিজয়বাবুর দিকে। বিজয়বাবু গুম মেরে বসে আছেন, মৃদু হাসি মুখে। ভীষণ বিরক্ত হয়ে আবার একটা বই টেনে নিল এবং যে-কোনো পাতা উলটিয়েই একটা পাতা মেলে ধরল চোখের সামনে—"মোটকা মানুষ হোঁৎকা মুখ,

বুদ্ধি ভোঁতা আহাম্মুখ—"।

লাইন দুটো পড়েই হাসি চাপতে পারল না অরুণ। তাকাল আবার—ঠিক বিজয়বাবুর বর্ণনা। বিজয়বাবু তেমনি চুপ, নির্বিকার। শুধু আনন্দ পাচ্ছেন, আচ্ছা জব্দ হয়েছে মেসের লোক। যান না কেন বেড়াতে? বিজয়বাবু মনে মনে প্রতিপক্ষ দাঁড় করালেন। আর্মড-ফোর্স, ঠেঙিয়ে ঠাণ্ডা করে দেবে। প্রত্যেক দিন আমাকে বলা? কিন্তু বিজয়বাবু বেশিক্ষণ আনন্দ পেতে না পেতেই ক্লান্ত হয়ে পড়েন, মুখ আরও হোঁৎকা হয়ে ওঠে, হাসি দেখা দেয় মুখের কোণে।

সেই ঘরের সঙ্গে সমকোণে লাগাও ঘরে তাস-খেলা চলছে, অকসান ব্রীজ। ওই ঘরেরই চারজন খেলছে, একজন দর্শক অন্ধকার ঘর থেকে উঠে এসেছেন। দিলীপ আর মণ্টু, সুবিনয় ও পরেশ। একটা দান শেষ হতেই সুবিনয় ঝাঁপিয়ে পড়ল, "আপনি কি মশাই, স্পেড-টা রিপিট করতে পারলেন না?"

—আমার নয়, সাত, আর দশ নিয়ে চার তাসে বিবি। আমি কি করে—

—তাহলে ওই সময়ই বিবি মারা উচিত ছিল।

দিলীপ পিট গুণে ততক্ষণে উই-এর ঘরে লিখল দুশো।

—অনার্স?

মণ্টু তাস দিতে থাকল।

—আপনার সঙ্গে খেলতে গেলেই মশাই—

—আপনি কি জানেন মশাই—

সুবিনয়, পরেশ ক্ষেপে উঠেছে। সেই দৃশ্য কল্পনা করে অরুণ চেঁচিয়ে পড়ে উঠল, "একটা শুধায় আরেকটাকে, 'তুই বিড়াল না মুই বিড়াল'।"

—আঃ, বিজয়বাবু শব্দ করলেন।

অরুণ তির্যকভাবে দেখে হাসল, "আঁচড় কামড় চর্কিবাজী ধাঁই—"

—থামবেন, বিজয়বাবু ফিস ফিস করে গর্জালেন। রাস্তার পাশে ঘর। শেষে কি হাঙ্গামা বাঁধাবেন?

—অ, অরুণ চোখ ওলটাল। বিজয়বাবু ভয় পাচ্ছেন, অতএব আরও চেঁচিয়ে উঠল অরুণ, থামচা খাবল ডাইনে বাঁয়ে—

—থামলেন, জোরে গর্জে উঠলেন বিজয়বাবু।

অরুণ থতমত এবং সেই অবস্থায় 'আমি এমন চেঁচিয়ে পড়ছি কেন' প্রশ্ন মনে হতেই দৃষ্টি সরিয়ে আনল দেয়ালের পর। শাদা দেয়াল। অরুণ অর্থ খুঁজে পেল না, শুধু বুঝল আগে সে এমন করত না। কথাটা উঠতেই অরুণ চমকে উঠল, না—না। এ-টা ঠিক নয়, আমি তো এমন করি না। তাকাল বিজয়বাবুর দিকে। বিজয়বাবুর চোখ গোল হয়ে উঠেছে, চুল খাড়া খাড়া, গা বেয়ে ঝরছে ঘাম। বিজয়বাবুকে ওই অবস্থায় আবিষ্কার করে নিজেকে ধিক্কার দিতে থাকল অরুণ এবং বই বন্ধ করে উঠতে যাবে, সেই সময় মনে হলো, এখন তাহলে কি করি? এখন মাত্র, ঘড়ির দিকে তাকাতে সাহস পেল না, কারণ সে যটা ভেবেছে বলে মনে করছে, ঘড়িতে আসলে তার একঘণ্টা নিশ্চয়ই কম বাজছে। কম বাজছে? তাহলে কি করি? অতএব বাধ্য হয়ে অরুণ আর একটা বই টেনে নিল।

অন্ধকার ঘরে কমলের প্রশ্ন—তা কেন?

—এটা তাই। নাহলে হঠাৎ মাড়োয়ারীদের বিরুদ্ধে এই হৈ-হুজ্জোতের কারণ কি? আসামে তারা সাহায্য করেছে আসামীদের? তাহলে বুঝতে

পারছিস এতে লোকাল পলিটিক্সের চাল আছে। যে হর্ষ এতক্ষণ ঘুমিয়েছিল, সে-ই এখন বোঝাবার চেষ্টা করছে, "ক্যাপিটালিজমের নাভিশ্বাস উঠছে, দেখছিস না সারা পৃথিবীতে বর্ণবিদ্বেষের ঢেউ। এ না করলে তাদের—"

—থামা তোর ইজম্। চিন্ময় গর্জে উঠল, আজ সাতদিন ওই এক কথা, ক্যাপিটালিজমের নাভিশ্বাস। আর, দ্বিগুণ বিরক্ত হলো চিন্ময়, আর তোকেও বলিহারি যাই কমল, সাতদিন ওই এক কথা শুনছিস তবু তোর আশ মিটছে না।

হর্ষ চিন্ময়ের মুখ দেখতে পাচ্ছে না, তবু আগের অভিজ্ঞতায় এ-সময়ের চিন্ময়ের একটা চেহারা ভাসিয়ে নিতে পারল: বাঁ-কপালের শিরা প্রকট, নাক অ-স্বাভাবিক ফুলছে, কুতকুতে চোখ দুটো বড় হতে চাইছে, সারা শরীরের রক্ত ছুটে আসছে মুখে। হর্ষ হাসল, "আসল কথা যদি বলি তবে তো এখুনি তেড়ে মারতে আসবি। আমি বলছিলাম—"

অরুণ তখন মধ্যনাদে পড়ছে। খানিক আগে যে বিবেক দংশনে জর্জরিত হয়েছিল, পড়ার ধরন দেখে বোঝা যাচ্ছে, তা সে ইতিমধ্যে ভুলে বসেছে। "ক্ষ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফেরে পরশ-পাথর (বিজয়বাবুর রাগ চড়ছে), মাথায় বৃহৎ জটা (বিজয়বাবু এবার গর্জে উঠবেন), ধুলায় কাদায় কটা, মলিন ছায়ার মতো (এবার উঠবেন), ক্ষীণ কলেবর (হো-হো করে হাসতে চাইল অরুণ), ওষ্ঠে অধরেতে চাপি (বিজয়বাবুর মুখে কি হাসি আছে?) অন্তরের দ্বার ঝাঁপি (হাঁ, ঠিক), রাত্রি দিন তীব্র জ্বালা জেলে রাখে চোখে, তাই", অরুণ থামল, কই বিজয়বাবুর তো কোনো আত্মীয়-স্বজন নেই, সেজন্য কি উনি রাত্রি-দিন এমন চুপ-চাপ বসে থাকেন? শুধু আপিস আর মেস, মেস আর আপিস। তবে কি বিজয়বাবুর কোনও তীব্র আঘাত আছে?

বিজয়বাবু অনড়, অটল। অরুণের চেঁচিয়ে পড়ার মধ্যে ছেলেমানুষি আবিষ্কার করলেন, ছোঁড়াটা ভেবেছে আমি ক্ষেপছি। আহাম্মুক! আর তোরা যে নয়দিন, বিজয়বাবু বেরুনো বন্ধ হবার তারিখের সঙ্গে আজকের তারিখ মেলালেন, কত হুট-হাট্ খুট-খাট্ করতিস, এখন কি? হর্ষর বড় বড় বক্তৃতা, ইজম্ মারানো। যাক্ না দাঙ্গা থামাতে? কংগ্রেস-কে গাল দেওয়া—আরে ছোঃ, বিজয়বাবু বেশিক্ষণ চিন্তা করতে পারেন না, একটুতেই ক্লান্ত হয়ে পড়েন। অতএব মুখ হোঁৎকা হয়ে উঠল, মুখের কোণে দেখা দিল

হাসি। দৃষ্টি নত করতে গলায় একটা আঘাত পেলেন, তাড়াতাড়ি ডান হাত উঠে এলো এবং সঙ্গে সঙ্গে অরুণের দিকে তাকালেন। অরুণের তাকানো দেখে শরীর শির শির করে উঠল, "ছোঁড়াটা বাইরেও যেতে পারে না"। এবং তারপরেই "একটু যে একা থাকব," ভাবতেই বিরক্তির স্রোত উত্তাল হয়ে উঠল। আর এই প্রথম ঘরে একা না থাকার জন্য ভীষণ চঞ্চল হয়ে উঠলেন। বাইরে যাবে? প্রশ্ন হতেই মনে পড়ল, কারফিউ। সব বিরক্তি গিয়ে পড়ল কারফিউ-এর ওপর। তাস দিতে দিতে হাই তুলে দিলীপ হাঁকল, "মোহন, জায়গা কর্"।

—সে কি? বিধান ঘড়ি দেখল, এখন তো সবে আটটা।

—আটটা! দিলীপের মাথায় সময় একটা প্রচণ্ড বোঝা চাপিয়ে দিল। এতক্ষণ তাস খেলার পর যখন দশ-টা বাজার দুঘণ্টা দেরি আছে জানল, তখন হালই ছেড়ে দিল সে। দিলীপের হতাশ আট-টা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে পরেশ তাস তুলতে গিয়ে থামল, এর কোনও মানেই হয় না। তাড়াতাড়ি তাস তুলে হরতনের টেক্কা, বিবি, নয়, ছয় পর পর সাজাতে সাজাতে নিজেকে অন্যমনস্ক করে তাস-খেলায় সমর্পণ করল নিজেকে।

বিধানের কথায় সুবিনয় যখন জানতে পারল, তখনও প্রায় দু-ঘণ্টা খেললে খেতে যাওয়া যায় এবং তারপরও একঘণ্টা জেগে থাকতে হবে, তখন, রাগে তার শরীর কড় কড় করে উঠল। তিন ঘণ্টা জেগে থাকতে হবে? কিছু করতেই হবে এ-সময়, হয় গল্প না হয় তাস, না হয় শুয়ে থাকা, খিস্তি? যদি এই মাত্র খাওয়া হয় তবে? তবে কি ঘুম আসবে? সুবিনয় তাস তুলতে গিয়ে বলেই ফেলল, "না. ভালো লাগছে না।"

'না—ভালো লাগছে না' কথাগুলো সবার মনে ঢেউ তুলল। সবাই যেন একই সঙ্গে হাত গুটিয়ে নিল এবং সময় স্থির দাঁড়িয়ে গেল।

—তাহলে কি করবেন? বিধান প্রশ্ন করেই চুপ, কারণ সে তাস খেলতে জানে না, শুধু দেখে। এই দেখারও একটা শেষ আছে। তবু এই দেখেও তো সময় কাটছিল। সময় কাটছিল। বিধান হোঁচট খেলো। কোথায় কাটছিল? এতক্ষণ খেলার পর মাত্র আট-টা! বিধান দমে যেতে থাকল। কিন্তু খেলা থামলে আমি থাকব কি নিয়ে? তাকাল একবার।

বিধানের প্রশ্ন সবার মনে প্রশ্ন তুলল, তাই তো কি করা যায়?

—তাহলে হোক, কি করা যায়? যেন ক্লান্ত মৃত কতকগুলো লোক,

যাদের ইচ্ছে নেই, আশা নেই, ভবিষ্যৎ নেই। অতএব খেলতে হচ্ছে, খেলতে হবে বন্দীশালায় সময় কাটাবার জন্য।

—হর্ষ, শুনেছিস নাকি?

হর্ষ চুপ। কোনও উৎসাহ প্রকাশ করল না।

—কমলাপুর আর মিত্র পাড়ার বোর্ড থেকে রায় সাহেব আউস্ট হয়েছেন। বিরিঞ্চিলাল দিয়েছে থোঁতা মুখ ভোঁতা করে। শুনছি বেগুন-বাড়ি আর পলাশপুরে দাগা-রা মেজর শেয়ার কিনে নিয়েছে।

হর্ষ তড়াক করে লাফিয়ে উঠল, "দ্যাটস দি পয়েণ্ট। তাই তো বলছিলাম এই হঠাৎ বাঙালী প্রীতির মূল কোথায়। সাধেই হরিসাধন মিত্র-কে দিয়ে এডিটোরিয়াল লিখিয়েছে মাড়োয়ারীদের বিরুদ্ধে। রায়সাহেব তো একটা গোলমালই চাইছেন। আরও তিনটে গার্ডেন যদি বিরিঞ্চি লাল নিতে পারে, তবে—"

—রাখ্ তোর বস্তা পচা কথা, চিন্ময় ফেটে পড়ল। গোলমাল করছে গুণ্ডারা আর উনি দেখছেন চা-বাগানের পলিটিকস!

—যা সত্যি তাই বলছি।

—সত্যি?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ,। হঠাৎ—হঠাৎ কোনও জিনিষ হয় না, বুঝলি। চা-বাগান-গুলো বেহাত হয়ে পড়লে এমন-প্রীতি খুবই লক্ষ্য করবি। এখন যদি একটা বাধে তবে রায়সাহেবের পোয়া বারো।

—যা যা—গুণ্ডাদের ইয়েকে তোর ও-ভাবে—

চিন্ময়ের সঙ্গে লেগে গেল হর্ষর তর্ক। হর্ষ যত বোঝাতে চাইল, চিন্ময় ততই বুঝতে চাইল না। "দূর তেরি, এর সঙ্গে কথা বলে," ভেবেই হর্ষ চুপ করে গেল। চিন্ময়কে সে একদম পছন্দ করে না। কথাও বলে না অ-প্রয়োজনে। কারফিউয়ের জন্য বাধ্য হয়ে ঘরে থাকতে হচ্ছে, আর ঘরে বন্দী আছে বলেই কথা বলতে হচ্ছে, নইলে কে বলে ওর সঙ্গে কথা।

চিন্ময়ও রাগে গর গর করছিল এবং হর্ষর ওপর বিরক্ত হয়ে বাইরে যেতে চাইল অথচ বাইরে যাবার কথায় মনে হলো কারফিউ, অতএব চুপ করে বসে থাকতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে সব রাগ গিয়ে পড়ল কারফিউ-এর ওপর।

মেসের সবাই যখন এমন একটি অধিকার হরণের ঘটনায় মূহ্যমান ঠিক সেই সময় একটা প্রচণ্ড গোঁ-গোঁ শব্দ স্টেশনের দিক থেকে এগিয়ে এসে

ঝাঁপিয়ে পড়ল মেসের ওপর। মেস-টা একটু আগে থেকেই নিরাশায় মরে যাচ্ছিল। তখন এই শব্দ মেসের মৃত্যুকে দ্রুততর করে চলে গেল রাস্তা কাঁপিয়ে পাড়া কাঁপিয়ে সকলকে জানান দিয়ে। অরুণ আলো নিবিয়ে দিল, তাসের ঘরে বিধান। সব ঘর অন্ধকার, নিশ্চুপ। শুধু রান্নাঘরের মরা আলোর নিচে উনুনের সামনে বসে ঝিমুতে থাকল মোহন এবং ভাতের ফ্যান উপচে উপচে হাঁড়ির গা বেয়ে পড়তে থাকল উনুনে। মোহন ভাত চড়িয়েই যেন মরে গেছে।

ট্রাক এগিয়ে যাচ্ছে।

তপন তখন ডাক্তার পাড়ার রাস্তায় অন্ধকারে গা ঢাকা দিতে দিতে চলেছে বাড়ির দিকে। খাঁ-খাঁ করছে পথ। দু-পাশের বাড়ির দরজা, জানালা বন্ধ। নিস্তব্ধ, নিশ্চুপ যেন কেউ থাকে না পাড়ায়, প্রেতপুরী। তপনের শরীর ছম্ ছম্ করে উঠল। এখন যদি কেউ এসে সামনে দাঁড়ায়, পুলিশ! তপন হাঁটার বেগ দ্রুত করল। কে যেন পিছন পিছন আসছে! কে? তপন মুহূর্তে মরে গেল! পুলিশ? কারফিউ অমান্য করেছে, আজ নিস্তার নেই। সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার, তারপর—, কিন্তু যদি বাঁচা যায়? তপন শরীর কাৎ করল, যেন ওই কাৎ করলে দেখতে পাবে না পুলিশ এবং ওই অবস্থায় নিজের মধ্যে নিজে অসংখ্য বার বাঁচার চেষ্টা করে সেই ক্ষণটির প্রতীক্ষা করতে থাকল, যে-ক্ষণটিতে পুলিশ এসে তার কলার চেপে ধরবে, অথবা দূর থেকে 'দুম্' শব্দের সঙ্গেই মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে যাবে।

হঠাৎ গোঁ গোঁ শব্দ যেন কাছে এসে পড়ল। তপন মরিয়া হয়ে তাকাবার চেষ্টা করল এবং একটা "স্ক্রে—ট" শব্দ হয়েই শব্দটা মিলিয়ে গেল। তপন ধড়ে প্রাণ পেল। বড় রাস্তা দিয়ে মিলিটারি ট্রাক বেরিয়ে গেল ফায়ার বিগ্রেডের দিকে। তপন এগুলো। যাকে সে পুলিশ ভেবে মরে গিয়েছিল, তাকে একটা ঝোপ রূপে আবিষ্কার করে ক্ষেপে উঠল এবং বিনতাদের বাড়ি থেকে রাস্তায় নেমে এতক্ষণ পুলিশ, কারফিউ-এর ভয়ে যে-রাগটা ভুলে গিয়েছিল, তা চাড়া দিয়ে উঠল: ঝাঁটা মারি কারফিউ-এর। কোথায় দাঙ্গা হচ্ছে, তা-না আমাদের পাড়ায়—

বিজ-বিজ করতে লাগল তপন। বিরক্তির কারণ এই যে, যবে থেকে কারফিউ চালু হয়েছে, তবে সে বিনতার সঙ্গে কথা বলতে পারছে না। বাবা থাকেন বাড়িতে, তা ছাড়া বিনতার ছোট-ভাইটা এত পাকা যে তপন

কিছুতেই ওর উপস্থিতি সহ্য করতে পারে না। বাড়িতে এতগুলো লোক থাকলে কথা বলা যায়? কিন্তু সময় কোথায়? সকালে বিনতার স্কুল, দুপুরে তপনের আপিস। একমাত্র সন্ধ্যে ছাড়া দেখা করবার জো নেই। বাবা থাকেন না, পাকা ভাইটা না—দিব্যি ন-টা পর্যন্ত গল্প করা যায়। সন্ধ্যের পর অন্ধকার হলে পাড়ার ছেলেগুলোর অজস্র চোখ ডিঙিয়ে কোনোমতে একটা কৈফিয়ৎ তৈরি করে আসা সহজ হয়ে উঠে। পাড়ার ছেলেদের কথা মনে হতেই "লুকিয়ে প্রেম করি" শব্দগুলো যেন আপসে স্পষ্ট হয়ে উঠল তপনের মনে আর লুকিয়ে প্রেমের পর কারফিউ—ছ্যাঃ ছ্যাঃ—কারফিউকে ধিক্কার দিতে দিতে মনে হলো, কারফিউ হবার সঙ্গে সঙ্গে আমিও তো বাতিল হয়ে যাচ্ছি। বিনতা যদি এ-সময় আমাকে আমার প্রেত বলে সন্দেহ করে? কারফিউ হবার আগেই লুকিয়ে অন্ধকারে বাবা, বিজুকে এড়িয়ে দেখা করি আর এখন নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে দেখা করছি—একথা বিশ্বাসই করবে না বিনতা। আমাকে দেখে মনে করবে, আমি তপন নই, তপনের ছায়া। এ-কথা ভাবতেই তপনের শরীর গরম হয়ে উঠল এবং কারফিউ যে তপনকে তপনের প্রেত করে দিচ্ছে, আবার স্মরণ হতেই মনে মনে সে ক্রুদ্ধ হলো।

ঘরে ঢুকতেই মা বকে উঠলেন, "তুই কি শেষে অনাসৃষ্টি ঘটাবি?"

তপন উত্তর দিল না, একেই বিরক্ত এবং ক্রুদ্ধ তার ওপর মা-র কথার জবাব দিতে গেলে খিঁচড়ে যাবে মন, তাই চুপ করে ঘরে চলে গেল।

একটা বাধাবে দেখছি। আজ বাজারে কাকে খুন করেছে, পুলিশ একশজনকে গ্রেপ্তার করেছে, আমার ছেলে, মা ভাবনা শেষ না করতেই অজানা আশঙ্কার একটা অশুভ কিছু প্রত্যক্ষ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে চলে এলেন তপনের ঘরে, "আজ কিছু হয় নি তো?"

মা-র অবস্থা দেখে তপন হো হো করে হেসে উঠল, "হলে কি দেখতে আমায়?" উত্তর দিয়েই তপন আবার ক্ষেপে উঠল, শা-লা, কারফিউকে বলিহারি। আজ দুদিন শান্ত আছে, তবু—সব রাগ গিয়ে পড়ল জেলার ডেপুটি কমিশনারের ওপর। কি অ্যাডমিনিস্ট্রেশান! অথচ এখন রাগতে গিয়ে বিনতার মুখ ভেসে উঠল। তপন শান্ত হলো, বিনতা যদি ভুল বোঝে? —ভুল বোঝা উচিত নয়, মিলনপাড়ার ছোট্ট টিনের ছোট্ট একটি ঘরে দাঁত দিয়ে সুতো কাটতে কাটতে ভাবল সরলা। স্কুলে যাবার পথেই তো বলে এলাম, এ-সময় পড়াতে যাব কি করে? সকালে আমার স্কুল, দুপুরে ওদের।

সরলা সুঁচের ফোঁড় দিল, ন. ন-টা দিন যাচ্ছি না, নির্ঘাৎ মাইনে কাটবে। ন-দিনের মাইনে, হিসেব করতেই মাথা ঘুরে উঠল সরলার। সরলার সামনে একটা কালো মূর্তি এসে দাঁড়াল, দাঁড়িয়েই প্রায় বক্তৃতা দিয়ে ফেলল : ত্রিশ টাকা মাস হিসেবে ন-দিনের মাইনে ন-টাকা কেটে নিয়েছেন মন্মথবাবু। এরপর যতদিন যাবে না, ততটাকা কাটা যাবে, হয়ত চাকরিও যেতে পারে। তোমার আয়ে সংসার চলে, এই টাকা কাটার জন্যে তোমার পিতৃদেবের ওষুধ কেনা হবে না, ছোট ভাই সন্টুর স্কুলের মাইনে দিতে পারবে না। কারফিউ আর কিছুদিন চললে অন্ধকার দেখবে। ভাত চড়বে হাঁড়িতে একবেলা, সন্টু স্কুল থেকে এসে খেতে না পেয়ে ঘ্যাঙাবে, বাবার অসুখ বেড়ে যাবে, তোমার খাওয়া ঠিকমতো হবে না, মা-র কাপড় ছিঁড়ে ছিঁড়ে ন্যাকড়া হবে। একদিন স্কুল থেকে আসার পথে মাথা ঘুরে—

সরলা ঠেলে সরিয়ে দিতে চাইল কথাগুলো এবং তাড়াতাড়ি ফোঁড় দিতে থাকল কাপড়ে।

সৈনিকদের টহলের বিরাম নেই। মাথায় লোহার টুপি, কাঁধে রাইফেল, পায়ে বুট-পট্টি, পরণে খাঁকি ইউনিফরম। সৈনিকদের বুটের শব্দ রাস্তা দিয়ে ঘরে উঠে আসতেই সরলা সেলাই থামাল। ঘাড়টা পেছন দিকে ঠেলে, গলাটা সামনের দিকে বাড়িয়ে, চোখের দৃষ্টি পাঠাতে চাইল পরদার ফাঁক দিয়ে পাশের ঘরে, সন্টু আছে তো! প্রথমে ঠাহর না হতে একটু স্থান পরিবর্তন করল। কিন্তু ঘর অন্ধকার, বাবার অস্ফুট কাতরানি আর নিজের মনের অ-ভাবিত আশঙ্কা ডিঙিয়ে দৃষ্টি কিছুতেই সন্টুকে আবিষ্কার করতে পারল না। সন্টু বেরিয়েছে! একটা ভয়ঙ্কর সর্বনাশ ঘটেছে—মনের মধ্যে এমন এক অবস্থার সৃষ্টি হতে না হতেই পাগলের মতো সেলাই ফেলে দিয়ে, মেঝের আঁচল লুটিয়ে, বেণীকে পিঠের ওপর ভাঙতে দিয়ে চৌকাঠে গুঁতো খেয়ে পর্দা প্রায় ছিঁড়ে ফেলার মতো করে ছুটে এলো এ-ঘরে।

—কে রে?

বাবার কণ্ঠ প্রশ্ন করেই চুপ। বাবার পাশে সন্টুকে অঘোরে ঘুমোতে দেখে আশ্বস্ত হলো সরলা। তবু তখনও বুক ঢিপ-ঢিপ, কারণ পল্টনদের জুতোর শব্দ তখনও মিলিয়ে যায় নি, যেতে যেতে যাচ্ছে না। আবার এসে বসল সেলাইয়ে। দু-এক ফোঁড় দিয়ে কেমন ক্লান্তি লাগল। সেলাই নামিয়ে রাখল। কি একটা করা হয় নি বলে মনে হলো সরলার। বিকেল থেকে

কি কি করা উচিত ছিল তার খতিয়ান নিতে গিয়ে দেখল, সব কাজই সে করেছে, অথচ মন বলছে—না, না। তবে কি টিউশানি করতে যাচ্ছি না বলে এমন মনে হচ্ছে? টিউশানির সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল কারফিউ-এর কথা। অতএব কিছু বলার নেই, করার নেই, অতএব আবার মন দিতে হলো সেলাইয়ে।

"ইহা সুখের সময় ছিল, ইহা দুঃখের সময় ছিল", অরুণ সিগ্রেট ধরাল। কিন্তু প্রাত্যহিক অভ্যাসে যে বই টেনে নিয়ে পড়া প্রায় রুটিনের মতো এবং পড়তে পড়তে ঝিমুনো, পরে চট্ করে মশারি ফেলে দিয়েই ঘুম, তা আর সম্ভব হলো না। একবার টেনেই থমকে গেল ও সিগ্রেট টানতে ভুলল। "ইহা সুখের সময়, ইহা দুঃখের সময়—" মনে পড়তেই অরুণ মনে মনেই উত্তর দিতে লাগল আমাদের যুগ সুসময় নয়। কারণ কারফিউ জারি হয়েছে। শুধু এখানেই নয়, প্রায় সারা বিশ্বের দুই তৃতীয়াংশে এই যন্ত্রণা। যন্ত্রণা, কারণ মানুষকে স্বাধীনতা দেওয়া হচ্ছে না, না দিলে তাদের সুবিধে এবং ওদের সামনে থাকে সবকিছু আর আমাদের সামনে—অরুণ আর না ভেবে বই টান দিতে গেল। অথচ ধৈর্য কোথায়, বড় ক্লান্ত। সিগ্রেটের লম্বা ছাই গায়ের ওপর ঝরে পড়ল। বাঁ হাত দিয়ে ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে ক্লান্ত হয়ে পড়ল, চোখে ঘুম নেই। অরুণ চলে এলো সেই ঘরে যেখানে খাওয়ার আগপর্যন্ত চলছিল তাস খেলা।

ঘন ঘন দুটো টান দিয়ে এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে অরুণ প্রস্তাব দিল, "হবে নাকি এক হাত?"

প্রস্তাব জনসাধারণের সামনে ছোঁড়া হলো। জনসাধারণ মানে মেসের সবাই, বাদ শুধু বিজয়বাবু, বাদ শুধু বিধান। বিধান বয়েসে সর্ব কনিষ্ঠ বলে সে সকলের সামনে সিগ্রেট খায় না। তাই বসে আছে অন্ধকার ঘরে।

প্রস্তাব নিরর্থক, কারণ যারা তাস খেলছিল তারা ক্লান্ত। আপিস কারফিউ-এর জন্য বন্ধ হচ্ছে সাড়ে চারটেয়। মেসে এসে হাত-মুখ ধুয়ে কিছু খেতে না খেতে সাড়ে পাঁচ, পৌনে ছয়। বাইরে বেরুনো বন্ধ, এমনকি রাস্তার দিকের জানালা খোলা বে-আইনি, অতএব কি করা? অতএব খেলো তাস। কিন্তু একটা উত্তেজনায় মানুষ কতক্ষণ আটকে থাকে? ঝিমুচ্ছে সবাই। পরেশ ঝিমুতে ঝিমুতে পাঁচ-টার সময়কার মনটিকে হঠাৎ পেয়ে গেল, নির্মল দাদুর অবস্থা সন্ধ্যের দিকে খারাপ হয়। সে-সময় একা

কিন্তু, আমি না গেলে! নির্মল দাদু আমায় এত ভালোবাসেন। ওঁর কাছে বসলে এত শান্তি, আনন্দ অথচ অসুখের সময়ই যেতে পারছি না, পরেশ উত্তেজিত হয়ে উঠল মনে মনে। শালা কারফিউ! সব রাগ গিয়ে পড়ল কারফিউ-এর ওপর।

আর সুবিনয়, দিলীপ এতক্ষণ বাঁধের ধারে কোন মেয়েটা কোনদিন কোন শাড়ি পরে আসবে এবং আজ যদি দেখা হতো তবে ডাক্তার পাড়ার মেয়েটার লাল, সুন্দর পাড়ার সেই লম্বা ফর্সা মেয়েটার বাদামি, বেঁটে আঁচিল-ওয়ালা মেয়েটার রেশমী শাড়ির ওপর সুপুষ্ট স্তনকে দেখতে পেত। আফশোষ হচ্ছিল দুজনেরই, তবু এই কল্পনার একটা শেষ আছে, ভাবতে ভাবতে তারা উভয়ে উভয়ের কাছে সরে এসেছিল এবং দুজনে দুজনকে স্পর্শ করে একটা উষ্ণ সুখ অনুভব করছিল। সুখ অনুভব করতে করতে হটাৎ দিলীপ সরে গেল, সুবিনয়ও—যেন দুজনে এটাকে অন্যায় মনে করেছে ঠিক একই সময়, যেন ওদের ভাবনা ঠিক একই পথে এগিয়ে চলে, একই জায়গায় থামে, হোঁচট খায় আবার চলে, সুতরাং শেষ হয়। অথচ সময় এগুচ্ছে না। এগুলে ঘুম পেত। চোখ জড়িয়ে আসত, তাই বসে থেকে থেকে হাঁফিয়ে উঠছে। না বসে উপায় নেই, বাইরে বেরুবে কি করে? আর সেই পাঁচ-টা থেকে হয় তাস, না হয় গল্প, না হয় গড়ানো—দ্যুৎ ছাই—

থোড়-বড়ি-খাড়া, খাড়া-বড়ি-থোড়। আপিস যাও, মেসে এসো, বন্ধ হয়ে থাকো।

মণ্টু খানিকক্ষণ হাতের পেশী নিয়ে ব্যস্ত হলো। তারপর পা, তারপর বুক, তারপর হাত, তারপর পা, তারপর বুক। তারপর হাত, তারপর পা,—হাত—পা, হাত-পা, তারপর—তারপর—

অতএব মণ্টুও ক্লান্ত হয়ে পড়ল এবং রাগ গিয়ে পড়ল কারফিউ-এর ওপর। ক্লাবে না গেলে কি স্বাস্থ্য ঠিক থাকে? ব্যায়াম করে সকালে, কিন্তু সকাল ছ-টা পর্যন্ত কারফিউ আর এ-দিকে বিকেল পাঁচ-টা থেকে সুরু। কি করা যায় অতএব মণ্টু ক্লান্ত এবং নিরুপায়। নিরুপায় অতএব আপন মনে পেশীগুলোর কথা ভাবতে লাগল।

বিধান সিগ্রেট খেয়ে এ-ঘরে এসে দেখল, এখানকার আবহাওয়া বিষণ্ন, বিমর্ষ। যেন অনেকদিন কেউ বাড়ির খবর পায় না। বিধান শেষ টান দিতে গিয়ে বুঝেছিল, এমন আর ক-দিন চললেই সব ব্যাপার বানচাল হয়ে

যাবে। ইরিগেশনের দুজন, এগ্রিকালচারের একজন, সেটেলমেণ্টের নরেশ, ডাব্লু-বি-এর শক্তি—কারুর সঙ্গে দেখা করা হচ্ছে না, অথচ এদের সঙ্গে না দেখা করলে আপিসের অন্যান্য কর্মীরা ভড়কে যাচ্ছেন, বলছেন—এরা জয়েন না করলে চাকরি নিয়ে টানাটানি। কন্‌ভিন্স করতে হবে, আবার ওদিকে সেণ্ট াল গবর্মেণ্ট কর্মীদের সঙ্গে দেখা করতে হবে, তাদের স্ট্রাইকে—, বিধান ভাবতে পারল না। কি করে ভাববে? অতএব চলে এসেছিল এ-ঘরে। চেয়ে দেখল সবার মুখ গম্ভীর, সবাই কিছু চিন্তা করছে। কিন্তু কথাটা বলা দরকার, অতএব সে হর্ষের দিকে এগিয়ে এল।

হর্ষ চোখ বুঁজে পা ছড়িয়ে দেয়ালে ঠেস দিয়ে ভাবছিল, কারফিউ জীবনকে পঙ্গু করে দিচ্ছে। সাধারণ মানুষের মনে জাগছে ফ্রাসট্রেশান। এমন কি আমার মনে, হর্ষ খেই হারিয়ে ফেলল এবং কি ভাবছিলাম, এই প্রশ্ন নিজেকে করে লজ্জা পেল। তবে কি পার্টি আপিসে যাচ্ছি না বলে হতাশা ঘিরে ধরেছে। হর্ষ বল সংগ্রহ করতে চাইল। সেই সময় বিধান সরে এল কাছে।

—হর্ষদা!

বিধানের স্বরে চোখ মেলল হর্ষ।

—কি করি বলুন তো? সামনে ডিমাণ্ড ডে অথচ কারফিউয়ের জন্য কয়েকজনের সঙ্গে মিট্ করতে পারছি না। মিট্ করতে না পারলে ভীষণ ক্ষতি হবে আমাদের। বিধানের কথা শেষ হতেই হর্ষের চোখে দ্যুতি খেলে গেল। মুহূর্তে ওর সামনে আর একটা অর্গল খুলে গেল, আসামের দাঙ্গাকে বেশিদিন চালাতে দেওয়ার পেছনে সেণ্ট্রাল গবর্মেণ্টের তবে এই চাল আছে? দাঙ্গা চললে আসাম আর বাংলাদেশে সরকারী কর্মচারীদের আন্দোলন বানচাল হয়ে যাবে, তখন আরও সুখে আরও দাপটে—

হর্ষ তড়াক করে লাফিয়ে উঠল। বিধানের প্রশ্নের উত্তর না দিয়েই একলাফে উঠোনে নামল।

হর্ষর আচরণে চিন্ময় বিস্মিত হলো। এতক্ষণ সে যা চিন্তা করছিল, সেই চিন্তা চলতে চলতে হঠাৎ বাধা পেল। চিন্ময় বেশি ভাবতে পারে না। মিনিট পাঁচেক ভাবার পরই প্রথম ভাবনায় আসে এবং প্রথম ভাবনা থেকে আবার সুরু করে সেই ভাবনা যা সে মিনিট পাঁচেক ভেবেছিল। চিন্ময়ের ভাবনা প্রথমে বাড়ির কথা ভাবল। এক পলকে সে মা-বাবা, ছোটবোন সামু মিনুকে দেখতে পেল হাসি হাসি ভাবে, তারপর ভাবল বাড়ি যাওয়া

দরকার। তারপর ভাবল, বাড়ি যেতে গেলে সন্ধ্যে সাতটার ট্রেণে যেতে হবে, কিন্তু কারফিউ জারি পাঁচটায়, অতএব—চিন্ময় আর ভাবতে পারল না। আবার ফিরে এল প্রথম ভাবনায়। অর্থাৎ প্রথমে বাড়ির কথা ভাবল, একপলকে মা বাবা ছোট বোন সামু মিনুকে দেখতে পেল হাসি-হাসি ভাবে, তারপর ভাবল ইত্যাদি ইত্যাদি। শেষ ভাবনায় এসে আবার প্রথম ভাবনায় চলে গেল। সেই সময়ই হর্ষকে একলাফে উঠোনে নামতে দেখেই সে-ও তড়াক করে নেমে পড়ল খাট থেকে এবং কিছু না ভেবেই চলে এল নিজের ঘরে।

কমল একটু ঘুম কাতুরে। এখন বেড়ানো নেই, অতএব ওই সময়টুকু ও ঘুমিয়ে কাটায়, কারণ করবার কিছু নেই। তাস খেলতে পারে না, বই পড়তে ভালো লাগে না, গল্পও বেশিক্ষণ করে না। সুতরাং ঘুম, অতএব সে ঘুমোয়। কিন্তু ঘুমেরও শেষ আছে! একটা মানুষ আর কতক্ষণ ঘুমুতে পারে? কমলের চোখ এখন ঘুমকে অস্বীকার করছে। কমল নিরুপায়, কমল অসহায়। তাই রাগ গিয়ে পড়ল কারফিউ-এর ওপর। কারফিউ না হলে তো ওই সময়টুকু বেড়াতে পারত সে।

বিজয়বাবু নির্বিকার। চৌকির ওপর বসে থাকেন, অতএব তাঁকে কারফিউ স্পর্শ করতে অক্ষম। সেজন্য তিনি এখন এই ঘরে এতক্ষণ পরে একলা থাকার আরাম কুড়ুতে কুড়ুতে মেসের ছোঁড়াদের দুঃখে আনন্দ পেতে লাগলেন, ঠিক হয়েছে! ও ঘরে জুটেছে সব। যাও—অন্যে যখন আনন্দে হাসে, বিজয়বাবু তখন গম্ভীর হয়ে যান। মেসের লোকদের দুরাবস্থার কথা কল্পনা করতে করতে তিনি গম্ভীর হয়ে উঠলেন। এবং আরও আরও আরও দুঃখ আছে কপালে ভাবতে ভাবতেই হাঁফিয়ে উঠলেন। মুখ হোঁৎকা হয়ে উঠল, মুখের কোণে দেখা দিল হাসি। বিজয় অপেক্ষা করতে থাকলেন ঘুমের জন্য। ঘুমের আগে সিগ্রেট টানার প্রতীক্ষায়।

সন্ধ্যা আর মা লুডো খেলছিল। তপন প্রথমে মা-র পক্ষ নিয়ে হৈ-চৈ করে সন্ধ্যাকে হারাবার চেষ্টা করল। মা-র হাতে দানই পড়ছে না, ওদিকে সন্ধ্যা দিব্যি গুটি পাকিয়ে নিচ্ছে। মা চালছেন, দান পড়ছে পোয়া কিম্বা দুই। তপনের ইচ্ছা করছিল মা-র হাত থেকে ছক-টা কেড়ে নিয়ে নিজেই চালে। কিন্তু সন্ধ্যার দুটো গুটি পাকতে দেখেই তপন ভীষণ ক্লান্ত বোধ করল। সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ল। না, ভালো লাগেনা, ঘড়ির দিকে তাকিয়ে

মাত্র সাড়ে ন-টা আবিষ্কার করে আঁৎকে উঠল। এখনও ছু-ঘণ্টা জেগে না থাকলে ঘুম আসবে না। ছু ঘণ্টা! বাইরে যাবো? ভয় উঁকি দিল। অতএব বিছানা এবং বিছানায় এ-পাশ ও-পাশ করতে করতে মা এবং সন্ধ্যা কি করছে, কি ভাবছে তা ভাবতে চেষ্টা করল। কিন্তু কতক্ষণ ভাববে? অতএব এ-পাশ ও-পাশ, স্থতরাং এ-পাশ ও-পাশ।

সরলা তখন স্থতরাং অতএবের মায়া কাটাতে চেষ্টা করছে। মাকে ছুধ-খই খাইয়ে জানলার ধারে সরে এসে জানলা খুলতে গিয়ে খেয়াল হলো, কারফিউ, অতএব জানলা বন্ধ রাখতে হবে, স্থতরাং গরমে পচতে হবে। এই অতএব-স্থতরাং কাটাতে গিয়ে আর এক খপ্পরে পড়ল, মন্মথবাবু যদি টাকা কাটেন—সরলার বুক কেঁপে উঠল এবং কোনো কাজেই আর মন বসল না। রাগ গিয়ে পড়ল দাঙ্গার ওপর, পড়ল মারপিট-এর ওপর।

এখন রাত বেড়েছে, অতএব যারা জেগে ছিল তারা ঘুমোবার চেষ্টা করছে। ঘরে ঢুকেই অরুণ অবাক হয়ে গেল বিজয়বাবুর অবস্থা দেখে। বিজয়বাবু পাগলের মতো কি খুঁজছেন একবার চৌকির তলায় গলা বাড়িয়ে, আর একবার বিছানার চাদর-তোষক সরিয়ে দিয়ে। অরুণ ঘরে ঢুকতেই বিজয়বাবু থমকে দাঁড়ালেন। তাঁর চোখ-মুখ অসহায়, করুণ। অরুণের মনে হলো বিজয়বাবু কেঁদে ফেলবেন যেন। অরুণ বিমূঢ়, অনড়। পর মুহূর্তে বুঝতে পারল, বিজয়বাবু ঘুমুবার আগে সিগ্রেট খান, এখন তাই খুঁজছেন। বিদ্যুৎ চমকের মতো ত্বরিতে অরুণ একটা সিগ্রেট বাড়িয়ে দিল বিজয়বাবুর সামনে। বিজয়বাবু হে-হে-হা-হা একটা অস্বাভাবিক হাসি হেসে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়লেন সিগ্রেটের ওপর এবং নিয়েই জড়িয়ে ধরলেন অরুণকে। অরুণকে জড়িয়ে ধরা অবস্থায় আজ প্রথম বিজয়বাবু অন্যের আনন্দ নষ্ট করার জন্য কষ্ট পেলেন। আর অরুণ একটা প্রচণ্ড আবেগে কেঁপে কেঁপে উঠল। যে বিজয়বাবু কেনোদিন কারুর সঙ্গে কথা বলেন না, গল্প করেন না, এমন কি তাকান না, সেই বিজয়বাবু জড়িয়ে ধরলেন অরুণকে? অরুণ পুরো ব্যাপারটাকে আবর ভাবতে গিয়ে অবাক হলো। যে ব্যাপারটি স্মরণে থাকা উচিত জীবনভর, সেই ঘটনাটি মনেই করতে পারছে না অরুণ, বড্ড ক্লান্ত। শুধু মনে হলো সেই পাঁচ-টা থেকে কেবল পড়ছে, বন্দী হয়ে আছে। একটা ভোঁতা শ্রান্তির অভিজ্ঞতা। ঘুমের আয়োজন স্থরু করতে বেড-কভার তুলতে গিয়ে হোঁচট খেলো, এমন একটা ব্যাপার—একজন

মানুষ যে কোনও দিন ডেকে কথা বলেনি, হয়তো আর বলবে না, সে-ই আমাকে জড়িয়ে ধরল—একটা গোটা মানুষের ভালোবাসা—উঃ, অরুণ কেঁদে ফেলবে এবার। মানুষ মানুষকে ভালোবাসছে অথচ আমি সেই ভালোবাসা স্মরণ করতে পারছি না। অরুণ চারধার অন্ধকার দেখার আগেই বালিশ ঠিক করে লাফিয়ে উঠল বিছানায়, মশারি টাঙানো হলো না। মশারীর নিচে মানুষ, অতএব তারা অন্ধকার ছাড়া কিছুই দেখতে পেল না। সকালে উঠলেই আপিস। আপিস ফেরৎ মেস—তারপর? মণ্টু আর কমল ভাবতে চাইল না কারণ পারল না যেহেতু চোখের সামনে অন্ধকার। সরলা চোখ বুজেই দেখতে পেল বাবা যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে, এক ফাইল ওষুধের অভাব, সণ্টু ও ঘ্যাঙাচ্ছে। অথচ কি করব আমি? কারফিউ থাকলে—

আমি কি করতে পারি? একটা অসহায় ঢেউ উঠে ছড়িয়ে পড়ল, ছড়াতে ছড়াতে বড় হয়ে রূপ নিতে থাকল, আমরা কি করতে পারি? ঘুম থেকে উঠে আপিস, আপিস থেকে মেস, মেসের পর জানলা, কপাট বন্ধ। হয় তাস খেলা, না হয় খিস্তি। খোড়-বড়ি-খাড়া, খাড়া-বড়ি-খোড়। পরেশ, স্থবিনয়, চিন্ময়, হর্ষ, তপন—সব, সবাই ভাবছে, ভাবতে আরম্ভ করেছে।

একটা ছিদ্র দিয়ে আলো যেমন অবাধে চলে আসে অন্ধকারে, তেমনি এক অতি ক্ষুদ্র রন্ধ্র পথে কয়েক ঘণ্টার আবশ্যিক আটকে থাকার যাতনা, স্বাধীনতা হরণের প্রচেষ্টা প্রথমে ক্লান্তি আনল। ক্রমে সেই ক্লান্তি ছড়াল সারা শরীরে, তারপর সারা জীবনে। ঘুম—খাওয়া—আপিস—মেস—স্কুল, স্কুল—বাড়ি—ঘুম। তারপর? তারপর? সেই একই স্রোত চিরজীবন? আমাদের কিছু করবার নেই? মানুষের কিছু করবার নেই? সেই একই বৃত্ত যার যে-কোনো বিন্দু থেকে স্থরু করে আবার সেই বিন্দুতে পৌছনো। খোড়-বড়ি-খাড়া। একটা নিষ্করুণ, অসহায় আন্দোলন—যার কোনো মানে নেই, বর্তমান নেই, ভবিষ্যৎ নেই। নেই—নেই—নেই। আবার সেই অসংখ্য 'নেই' এসে চাপ চাপ হয়ে বসল সবার মনে, অতএব ক্লান্তি নামল। ক্লান্তি বিরক্তি আনল এবং বিরক্তি উত্তাল হয়ে অবশেষে ফেটে পড়ল ক্রোধে—

—না, চলবে না।

—না। না। না—

যেন অসংখ্য প্রতিবাদ মাত্র একটি শব্দ 'না' হয়ে বেরিয়ে আসতে চাইল। অথচ সেই বিরাট 'না' অসহায় ক্রোধ, নিরুপায় আক্রোশ, জ্বালাহীন বেদনা,

তীব্র অভিমান, তীক্ষ্ণ ঘৃণা নিঃশব্দে ঢেউ তুলতে তুলতে লক্ষ লক্ষ রক্ত মাংসের শরীরের মধ্যে ফেটে গুঁড়িয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে যেতে থাকল।

আশ্চর্য, শহরের আকাশে তখন খণ্ড খণ্ড কালো মেঘ ধীরে ধীরে জমাট বাঁধতে সুরু করেছে। জ্যোৎস্না সেই মেঘকে চিরে চিরে ছড়িয়ে পড়ছে। জ্যোৎস্না তিস্তার জলে। তিস্তার জল চঞ্চল, করলার জল স্থির।

আর সকলের মনের মধ্যে ফেটে পড়া অসংখ্য 'না', আক্রোশ, ক্রোধ, ঘৃণা নিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এসে পৌছুল আকাশের তলে।

অথচ নিচে তখন শব্দ। শ্লথ, বিচ্ছিন্ন, অনিয়মিত, অ-সম লয়—প্রায় অ-সৈনিকোচিত। খট্—খট্—খটা—খ—। ক্লান্তি, অনিদ্রা, অনাহারে মাথায় লোহার টুপি, কাঁধে রাইফেল, পায়ে বুট-পট্টি, পরণে খাকি ইউনিফরম—একদল মানুষ প্রাণপণে সৈনিকের কর্তব্য করতে চাইছে। তাদের পায়ের শব্দের সঙ্গে সৈন্যদের পূর্বপরিচিত চলার শব্দের কোনও সঙ্গতি নেই, মিল নেই।

খট্—খট্—খটা—খ—। ইউনিফরম পরিহিত একদল লোক সৈন্য হতে পারছে না, মানুষ হয়ে যাচ্ছে আর মানুষরা তখন নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছে।

একটি বিবরণ

রেভারেণ্ড ক্লীমেণ্ট মোরিণ

"আদিতে ঈশ্বর ; তাঁর আরাধনা করি"। মণ্ট্রীল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসার শাখার উদ্যোগে আয়োজিত সঙ্গীত বিভাগের গ্রীষ্ম শিক্ষাক্রমে 'প্রাচ্য-প্রতীচ্য নন্দনতত্ত্ব' পর্যায়ে তিন সপ্তাহব্যাপী অধিবেশনে ডক্টর রোজেটি রেন্‌শ-র সঙ্গে একযোগে ও তবলিয়া মহাপুরুষ মিশ্রের সঙ্গত-সহযোগিতায় ভাষণদানকল্পে এসে কলকাতার আলী আকবর সঙ্গীত বিদ্যায়তনের অধ্যক্ষ ও ভারতের সরোদের গুণী কলাকার মান্যবর অতিথি ওস্তাদ আলী আকবর খাঁ শান্ত ভক্তি-সমাহিত কণ্ঠে ঐ কথা কটি দিয়ে শুরু করলেন।

বক্তা বলে চললেন, "আমার অন্তরে ও আমার প্রার্থনায় জগদীশ্বরের পরেই যাঁর স্থান, তিনি সঙ্গীতের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতী।" উৎসাহী ছাত্র-মণ্ডলীর মধ্যে ছিলেন ধর্মসম্প্রদায়ের লোকেরা এবং ফরাসী ক্যানাডার সবচেয়ে প্রভাবশালী সঙ্গীতবিদ্যায়তনগুলির অধ্যাপকবৃন্দ ও বিভাগীয় প্রধানেরা। তাই সঙ্গে সঙ্গেই প্রশ্ন উঠল: "আপনাদের সঙ্গীতের দেবী তো তাহলে আমাদের সেণ্ট্ সিসিলিয়ার মতোই ?"

ওস্তাদজী বিস্মিত। মণ্ট্রলের ছাত্রেরাও যেমন ইতঃপূর্বে সরস্বতীর কথা শোনেননি, ওস্তাদজীও তেমনি কখনও পশ্চিমী সঙ্গীতের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর কথা শোনেননি। এক নতুন জ্ঞানের উত্তরে আরেক নতুন জ্ঞান। ছাত্রেরা অল্প কথায় সিসিলিয়ার পরিচয় দিলেন। এই দ্বৈত আবিষ্কারের আনন্দকে গুণিবর ভাষায় রূপ দিলেন: "আপনাদের সিসিলিয়া ও আমার সরস্বতী সঙ্গীতের রাজ্যে সহোদরা।"

তখনও তো একটিও সুর ওঠেনি ; কোনো তাত্ত্বিক তুলনার প্রশ্নও না। তবু ভবিষ্যতের কর্মকাণ্ডের প্রতিশ্রুতি ঐ মুহূর্তেই রচিত হয়ে গেল। যেখানে মনন ও অন্তর, পূর্ব ও পশ্চিম, স্থির প্রত্যয় ও লক্ষ্যের একাগ্রতায় সেই গৌরবান্বিত সমাবেশে মিলিত হয়েছে, সেখানে সেই মুহূর্তেই সঙ্গীতের দুই মহিয়সী দেবী তাদের ওপর একযোগে আশীর্বাদ ঢেলে দিলেন।

ম্যাক্‌গিল্ বিশ্ববিদ্যালয় ও ক্যানাডা কলা পরিষদের সহৃদয় সহায়তায়

মন্ট্রিল বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত দূরদর্শী ও পথপ্রদর্শককল্প এক কার্যক্রমের প্রথম ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পর্ব এইভাবেই শুরু হয়ে গেল।

প্রাচী-প্রতীচী সাংস্কৃতিক মূল্যসমূহের পারস্পরিক সমাদরের যে প্রকল্প ইউনেস্কো গ্রহণ করেছেন, তারই আদর্শমতে ইউনেস্কো ও ভারত সরকারের বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সংস্কৃতি দপ্তরের যুক্ত উদ্যোগে ১৯৫৮-১৯৫৯ সালে ডক্টর রেন্‌শ ভারতে ভারতীয় সঙ্গীতের যে গভীর জ্ঞানান্বেষণে নিযুক্ত হন, ওস্তাদ আলী আকবর খাঁর ক্যানাডা সফর তারই পরিণতি।

ভারতীয় ও পশ্চিমী সঙ্গীতের তুলনামূলক বিচারে শ্রীমতী রেন্‌শ কতদূর প্রাগ্রসর, তাঁর অধ্যয়নে তিনি কত গভীরে গেছেন, তার প্রমাণ এই শিক্ষা-ক্রমের আদ্যন্ত দেখা গিয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের সোশাল সেণ্টারের অধ্যক্ষের সহৃদয় প্রসাদে যে পরিবেশ রচিত হয়েছিল, তাতে চক্ষু-কর্ণের সুখ ছিল; সেখানে সাম্প্রতিকতম শ্রাব্যদার্শন সহায়কসমূহের আয়োজন ছিল। সেই পরিবেশে ডক্টর রেন্‌শ সরোদ ও তবলার পাশাপাশি কীবোর্ড-এ এবং টেপ্ ও রেকর্ডের বিরাট সমাবেশে পশ্চিমী-কণ্ঠসঙ্গীত, অর্কেস্ট্রা ও সঙ্গীতের দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন—এতে খ্রীষ্টানিটির উদয় থেকে বর্তমান কাল অবধি সঙ্গীতের দৃষ্টান্ত ছিল। অনুষ্ঠানকালে পর্দায় স্বরলিপি ও নির্লেখে পূর্ব-পশ্চিমী সঙ্গীতের তত্ত্ব তুলে ধরার সুযোগও তিনি গ্রহণ করেছিলেন।

জানা থেকে অল্প-জানা পার হয়ে অজানায় পৌছবার সঙ্কল্প নিয়ে ওস্তাদ আলী আকবর খাঁ ও ডক্টর রেন্‌শ বিলাবল্ ঠাট দিয়ে শুরু করলেন। এই ঠাটের সাতটি স্বর পশ্চিমী সঙ্গীতে বহুল প্রচলিত মেজর স্কেলের সাতটি স্বরের অনুরূপ। এক্ষেত্রে বর্ণমালাভিত্তিক ডো স্বরগ্রামের চেয়ে সোল্-ফা স্বরগ্রাম অনেক বেশি কাজে লাগে; এতে সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি এই সপ্তস্বর ডো, রো, মি, ফা, সোল, লা, সি নামে পরিচিত।

অন্যান্য সঙ্গীতরসিকদের মতোই এই ছাত্রমণ্ডলী ভারতীয় সঙ্গীতের স্বরগ্রাম সম্পর্কে এতদিন যা পড়েছিলেন, তাতে তাঁদের জ্ঞান বৃদ্ধি হয় নি, তাঁরা বরং দুর্জ্ঞেয়তার ঘোরেই পড়েছিলেন। তাঁদের ধারণা হয়েছিল, এই বিজাতীয় স্বরগ্রামে প্রতি অক্টেভে সুরমধ্যবর্তী বাইশটি জটিল ইণ্টারভাল আছে। এইগুলি এমনই সূক্ষ্মতায় স্থাপিত যে ভারতীয় সঙ্গীতের সঙ্গে জন্মাবধি পরিচয় কিংবা দীর্ঘকালব্যাপী আস্বাদনের অভিজ্ঞতা ছাড়া পিচ্-এর ঐ সূক্ষ্ম পার্থক্য বোঝা যায় না, ভারতীয় সঙ্গীতের রস আস্বাদনও সম্ভব হয় না। ওস্তাদ

আলী আকবর খাঁ প্রতি অক্টেভে সাতটি স্বরের উল্লেখ করায় পশ্চিমী দৃষ্টি-কোণের অনুকূল সহজবোধ্য, সরল ও সহজপ্রাপ্য গ্রন্থগুলি (আর তাও সংখ্যায় এত অল্প যে তাদের প্রতিনিধিস্থানীয় বলে ধরাও যায় না) থেকে যে সব ভুল ধারণা গড়ে উঠেছিল, তাতে ভারতীয় সঙ্গীতের রসবোধে পশ্চিমের কাছে এক অন্তরায় রচিত হয়েছিল। ওস্তাদজী কয়েক মিনিটের মধ্যেই এই অন্তরায় ঘুচিয়ে দিলেন।

তখনকার মতো অবশ্য তিনি ঐ পথে আর এগোলেন না—এতেও তাঁর সুবিবেচনারই পুণঃ পরিচয় মিলল। তিনি দেখালেন, একই বিলাবল্ ঠাট থেকে আরোহী, অবরোহী, বাদী ও সম্বাদীর বৈশিষ্ট্যে বহু রাগ রচিত হতে পারে। শুধু এই তথ্যটুকু দিয়েই তিনি থামলেন না; কোনো এক রাগের আরোহী ও অবরোহী, বিশেষ গুরুত্ববৎ স্বরবিশেষ ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করার সঙ্গে সঙ্গেই তানসেন কিংবা অন্য কোনো প্রাচীন সঙ্গীতগুরু কিংবা তাঁর নিজের পিতৃদেব পদ্মভূষণ ডক্টর আলাউদ্দিন খানসাহেব রচিত, আবার কখনও সঙ্গে সঙ্গে রচিত নিজেরই এক বা একাধিক গৎ পরিবেশন করে তিনি সেই রাগরূপকে জীবন্ত করে তুললেন।

পশ্চিমী সঙ্গীতে যেমন কোনো একটি থীম্ বা মেলডি স্কেলের সবকটি স্বর ব্যবহার করতে পারে (করতেই হবে এমন কোনো কথা অবশ্য নেই), তেমনি কয়েকটি গৎ-এ এমন রাগের পরিচয় পাওয়া গেল, যাতে বিলাবল্ ঠাটের সাতটি স্বরই উপস্থিত, যেমন বিলাবল্ রাগ ও লূম। কিন্তু অন্য গৎ-এ ছয় বা পাঁচ স্বরের রাগও দেখা গেল, যেমন পঞ্চস্বর দুর্গা ও শঙ্করা; অন্যদিকে মিশ্র রাগও আছে, যাতে আরোহীতে পাঁচ স্বর, অবরোহীতে সাত—মাড়-এর কথা মনে আসে; পাঁচ, ছয় ও সাত স্বরের আরো নানা মিশ্রণও দেখা গেল। মায়ার ঘোরে কিংবা পিছু-টানেই বাঁধা হোক, হালকা কিংবা দুষ্টুমিতে ভরাই হোক, প্রতিটি গৎ-ই এমন সুরময় যে ছাত্রেরা তাদের সহজেই মনে রাখতে পারেন; এইভাবে বিলাবল্ ঠাটের অন্তর্গত বিভিন্ন রাগের তত্ত্বগত অঙ্কাদি কোনো সচেতন প্রচেষ্টা ছাড়াই তাঁদের আয়ত্ত হয়ে যায়।

একই ভাবে অধ্যাপক খাঁসাহেব অতঃপর রাগ জৌনপুরী নিয়ে আশাবরী ঠাটের রাগব্যুৎপত্তিতে চলে গেলেন। আশাবরী ঠাট পশ্চিমী সঙ্গীতের ন্যাচরল্ মাইনর স্কেল্-এর নিকট আত্মীয়। আশাবরী ঠাটের ন্যাচরল্ সেকেণ্ড্ বা শুদ্ধ ঋষভের পরিবর্তে আশাবরী রাগের ফ্ল্যাট্ সেকণ্ড্ বা

কোমল ঋষভের প্রয়োগে মূল স্কেলের অনাত্মীয় স্বরের প্রথম দৃষ্টান্ত দেখা গেল। পশ্চিমী সঙ্গীতে এই প্রয়োগরীতির উদাহরণ সহজলভ্য, কারণ অ্যাক্সিডেন্টাল অল্‌টেরেশনের প্রসাদে কোনো স্কেলের সত্তা অক্ষুণ্ণ রেখেও স্বরবিশেষের উঁচু-নিচু করা যায়।

আশাবরী রাগের কোমল ঋষভ স্বাভাবিকের চেয়েও আরেকটু নিচু, এই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি শ্রুতির প্রসঙ্গ তুললেন। তিনি বললেন, "এই স্বরটি যেন বিষের ফোঁটা। ডাক্তারেরা জানেন, রোগবিশেষে স্বল্প পরিমাণে ব্যবহৃত কোনো কোনো বিষ ওষুধ হয়ে দাঁড়ায়। ঠিক তেমনই সতর্ক-ভাবে ব্যবহার করলে আশাবরী রাগের অতি কোমল ঋষভ বা লো ফ্ল্যাট্ সেকণ্ড, সঙ্গীতের সহায়; কিন্তু তার ওপর একটু বেশি সময় দিলেই, বেসুরো শোনাবে; তাতে রাগের সৌন্দর্য বাড়বে না, সৌন্দর্য শেষ হয়ে যাবে।"

ছাত্রেরা বুঝতে পারেন যে ফ্ল্যাট, সেকণ্ডের যে সাধারণ ও কোমলতর রূপ সরোদে আঙুলের কাজে তোলা যায়, সমান সুরে বাঁধা কীবোর্ড-এর যন্ত্রে তাদের পাওয়া যাবে না। কিন্তু এই ইণ্টারভাল পশ্চিমী তারের যন্ত্র ভায়োলিন, ভায়োল ও চেলো-য় এবং বায়বীয় যন্ত্রেও তোলা যায়। তাঁরা জানেন যে লোকসঙ্গীতে ও খালি গলার গানে এমনি অসম ইণ্টারভাল অনেক সময়েই পাওয়া যায়—অবশ্য এগুলি প্রায়ই গায়কদের অচেতনেই হয়ে যায়। কিন্তু ডক্টর রেন্‌শ তাঁদের স্মরণ করিয়ে দেন যে, অনেক পণ্ডিতের মতে, মীড়ের সূক্ষ্ম বিবর্তন একদা পশ্চিমী সঙ্গীতবিধির স্বাভাবিক অঙ্গ ছিল। উদাহরণত, ষোড়শ শতক ও তৎপূর্ববর্তী কালের পলিফনিতে মেজর ও মাইনর সেভেন্‌থ্-এর, অর্থাৎ শুদ্ধ ও কোমল নিষাদের একযোগে ব্যবহার—অ্যাসেণ্ডিং মেলডিক লাইন-একটি এবং ডিসেণ্ডিং-এ অন্যটি—থেকে অনুমান করা যায় যে বর্তমানকালের কী-বোর্ডের চেয়ে কোনো উচ্চতর ন্যাচরল্ সেভেন্‌থ্ ও কোমলতর ফ্ল্যাট্ সেভেন্‌থ্ তখন পাওয়া যেত। উপরন্তু, ঐ জাতীয় দৃষ্টান্ত বিরল নয়, বরং প্রায়ই পাওয়া যায়।

শ্রুতির তত্ত্বটি ভারতীয় সঙ্গীতের সবচেয়ে বিতর্কমূলক বিষয়গুলির মধ্যে অন্যতম। সেই তত্ত্বটি আলী আকবর খাঁ এত সহজ করে উপস্থিত করায়, এর সব রহস্যই কেটে যায়, ছাত্রেরাও পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারেন। তবু ছাত্রদের তো আগে হাঁটতে শিখতে হবে, তারপরে ছোটা। তাই ওস্তাদজী

ক্রমে ক্রমে শ্রুতির বিরাট চিত্রটি উদ্‌ঘাটন করবেন বলে স্থির করে আপাতত প্রসঙ্গটির আলোচনা মুলতুবী রাখলেন।

এবার একই স্বরের বিভিন্ন রূপ ব্যবহার করে এমন রাগের প্রসঙ্গ উঠল। খাম্বাজ শুদ্ধ ও কোমল নিষাদ, উভয়ই ব্যবহার করে। এখানেও ছাত্রেরা পরিচয়ের গণ্ডীর মধ্যেই রয়ে গেলেন। পশ্চিমী সঙ্গীতের মেলডির মাইনর স্কেলে, সিক্‌স্‌থ্ ও সেভেন্‌থ্, ধা ও নি, আরোহীতে মেজর, অবরোহীতে মাইনর—এতেও তো একই ব্যাপার ঘটে। রাগ মাঝ-খাম্বাজে খাম্বাজ রাগের স্বরই ব্যবহৃত হয়, কিন্তু থার্ড ও ন্যাচরল্ সেভেন্‌থ্-এর পরিবর্তে ফোর্থ ও লোয়ার ফ্ল্যাট্ সেভেন্‌থ্-এর ওপর জোর পড়ে। বাদী ও সম্বাদীর পরিবর্তে কেমন আশ্চর্য ফল পাওয়া যায়, এই রাগটি বাজিয়ে অধ্যাপক খাঁসাহেব তার প্রমাণ দিলেন।

শুরুতে তিনি সবকটি গৎ-ই তিনতালে বাজিয়ে শোনান, কারণ সঙ্গতিয়ার ঠেকার ষোলটি মাত্রা চার-চারে ভাগ করে দেওয়া হয়—এতে পশ্চিমী সঙ্গীত-কারদের চার বীটের তালের সঙ্গে মিল পাওয়া যায়। কিন্তু বিলম্বিত গৎ-এ তিনি ছন্দ আনেন, মাত্রাগুলিকে দুই, তিন, পাঁচের অসম বিভাগে ভাগ করে দেন; এতে তবলিয়ার সমবিভাগের ঠেকার সঙ্গে অমিল ঘটে, কিন্তু যোগফলে ষোলটি মাত্রাই পাওয়া যায়। এইভাবে অধ্যাপক খাঁসাহেব দেখিয়ে দেন যে চারবার চার মাত্রাই ষোল মাত্রার যোগফলে অর্থাৎ তিন তালের এক আবর্তী বা বৃত্তে পৌছবার একমাত্র উপায় নয়। পরে তিনি দুই, তিন ও ততোধিক আবর্তীও ব্যবহার করে দেখান।

সিংকোপেশনের বিরোধী অসমমাত্রিক তালের দৃষ্টান্তও পশ্চিমে একেবারে অজ্ঞাত নয়; ক্রিশ্চান গীর্জার লিটার্জি গান গ্রেগোরিয়ান্ চাণ্ট্-এ টাইম সিগ্‌নেচার এবং সাধারণ বারিং (barring)-এর ব্যবহারই নেই। লোক-সঙ্গীতে, যেমন হাঙ্গেরীর ক্ষেত্রে, পাঁচ, সাত এইরকম অসম মাত্রায় বিভাগ দেখা যায়। বার্টক্-এর সংগ্রহে এমন অনেক দৃষ্টান্ত আছে; এগুলি অনেক সময়ই চলতি টাইম সিগ্‌নেচার ও বার লাইন্‌স্ গ্রহণ করে। তালের অসম স্পেসিং কোনো কোনো কালে দুর্লভ বলে গণ্য হলেও, একে স্বীকার করে নিলে (টাইম্ সিগ্‌নেচার-এর বারম্বার পরিবর্তন অসম বারিং (barring)-এর প্রসাদে চোখে পড়ুক না পড়ুক) একে পলিফনিক যুগ ও বিংশ শতাব্দীর এক গুরুত্বপূর্ণ রীতি-বৈশিষ্ট্য বলে মেনে নিতে হয়।

সঙ্গীতে যেখানে পরিচিত টাইম সিগ্‌নেচার-এর কৃপায় বার্ লাইনে সাজানো পর পর বার্-এ দেখা যায়, সবকটিতেই সমান সংখ্যক মাত্রা—সিম্পল্ টাইম্-এ ২, ৩, ৪ এবং কম্পাউণ্ড টাইম্-এ ৬, ৯ অথবা ১২—সেখানে সঙ্গীত-কারেরা অসমমাত্রিক তালের কথা ভাবতেই পারেন না। এর কারণস্বরূপ বলা যায়, দীর্ঘকাল ধরেই এই ধারণা বর্তমান যে, বার্ লাইন্‌গুলির অর্থই হলো, সচরাচর প্রথম মাত্রায় জোর দিয়ে একই ভাবে পুনরাবর্তিত তাল।

এই বদ্ধমূল ধারণার একটি প্রমাণ এখানেই পাওয়া গেল। ছাত্রদের একটি ছোট ফরাসী-ক্যানেডীয় লোকগীতি গাইতে বলায় তাঁরা প্রতি চারটি মাত্রার প্রথমটিতে জোর দিতে থাকেন, কারণ যে কোনো চলতি সংস্করণে মাত্রাগুলিকে চার চার করে ভাগ করে দেওয়া আছে। ডক্টর রেন্‌শ কথাগুলিকে সুর না দিয়ে আবৃত্তি করতে বলার আগে পর্যন্ত তাঁরা বুঝতেই পারেন না যে এই সমমাত্রিক তালে কথাগুলির অর্থ একেবারেই উড়ে যায়। ডক্টর রেন্‌শ-র কথা শুনে তাঁরা বুঝতে পারেন যে অন্যান্য বার্ লাইন অগ্রাহ্য করে প্রতি আটটি মাত্রাকে ৪+৪ এর পরিবর্তে ৫+৩ এর বিভাগে ভাগ করলেই কথার স্বাভাবিক ছন্দ মেলডিতেও অক্ষুণ্ণ থাকবে। ডক্টর রেন্‌শ ছন্দ সম্পর্কে তাঁদের চিন্তা আরো উদার করে নেবার আবেদন জানালে তাঁরা দেখতে পান যে চার বীট্ অন্তর বার্ লাইনের (bar line) আরেকটি লোকগীতিতেও ৭+৯=১৬ মাত্রার পরেই পুনরাবৃত্ত স্ট্রেস্ পাওয়া গেল।

পশ্চিমী সঙ্গীতে ত্রিতালের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রয়োগের আরো কয়েকটি দৃষ্টান্তের পর অধ্যাপক খাঁসাহেব দাদ্রা তালে গেলেন। এই তালেও তিনি অনেকগুলি গৎ বাজিয়ে শোনান, কতকগুলি সাধারণ তালে, কতকগুলি ছন্দে।

ডক্টর রেন্‌শ অতঃপর দেখান যে সিংকোপেশনের বিরোধী অসমমাত্রিক তাল বার্ প্রতি চার মাত্রার সুরে যেমন, তেমনই স্বাভাবিক টার্নারি (ternary) টাইম্ সিগ্‌নেচারের কোনো একটিতে বাঁধা সুরেও সহজলভ্য। তিনি বলেন, "এটা যে শুধু লোকসঙ্গীতের ক্ষেত্রে সত্য, তা নয় ; পশ্চিমী সঙ্গীতের বিকাশের প্রতি পর্বেই এর দৃষ্টান্ত আছে, আদিমতম measured সঙ্গীত থেকেই এর হদিস মেলে।" উদাহরণত, আদিমতম কমিক অপেরা Adam de la Halle-এর ত্রয়োদশ শতকের 'Le Jeu de Robin et Marion'-এর নায়িকার গান, এবং পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে জনসাধারণ ও সুরকারদের মধ্যে জনপ্রিয়

'L'homme arme' গানটি ট্রিপ্‌ল্ টাইম্-এ বাঁধা ; কিন্তু কথাগুলির স্বর-ন্যাসে (accentuation) বার্ লাইনের তিন মাত্রার তালের পরিবর্তে অসম-মাত্রিক তালেরই পরিচয় পাওয়া যায়।

কথাগুলির স্বরন্যাসে গানের তালের সংকেত পাওয়া যায় বলেই যে এই বৈশিষ্ট্যটি কেবলমাত্র কণ্ঠসঙ্গীতেরই অঙ্গ, তা-ও নয়। যন্ত্রসঙ্গীতকারদের কাছে সুপরিচিত ব্রাহম্‌স্-এর অত্যন্ত প্রিয় এবং বাখ্ ও হাণ্ডেল্-এর ইনস্ট্রুমেণ্টাল স্যুইট্-এর উল্লেখ্য ক্যাডেন্‌শিয়ল রীতি তিন-দুই ক্রস্-রিদ্‌ম্ এই বৈশিষ্ট্যেরই সরলতম রূপ। এই রীতিটিকে প্রচলিত বিধির ব্যতিক্রম এবং সেই কারণে কেবলমাত্র বিশেষজ্ঞদের চিন্তার বিষয় ও বিশেষ ঢঙ বা বিশেষ কালের অঙ্গ বলে ধরে নেবার কোনো কারণ আছে কি ? কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীতের রাজ্যে এর সরল ও জটিলতর রূপের খোঁজ করা যাক না !

একথা তো সকলেই মানেন যে, নিতান্তই সাধারণ সুরকারদের মেলডি ও হারমনির চেয়ে পশ্চিমী সঙ্গীতের মহান্ স্রষ্টাদের মেলডি ও হারমনি অনেক সূক্ষ্ম, অনেক জটিল, অনেক সুসংবদ্ধ। কিন্তু তাঁদের তালের বেলায় ? তাঁদের তাল কি সত্যিই অত সহজ, না, আমরাই বিভ্রান্ত রয়ে গেছি ? মেলডি ও হারমনির মহত্তর কলানৈপুণ্যেই যদি সঙ্গীতের জগতের টম্-ডিক্-হ্যারি-দের ওপরে মহৎ শিল্পীদের স্থান নিরূপিত হয়, তবে সেই যুক্তিতেই কি বলা চলে না যে, সঙ্গীতগুণীদের তালও মিলিটারী মার্চ ও টি-টাইম্ মিউজিকের স্তরের অনেক ওপরে ?

ছাপার হরফে বাঁধাধরা টাইম্ সিগ্‌নেচার ও বার্-লাইনে যা দেখি, কোনো রচনার তালের সমগ্র সত্য তারই মধ্যে নিহিত আছে, সেই ভ্রান্ত ধারণা থেকেই বহু পশ্চিমী শ্রোতা দীর্ঘকাল ধরে তালকে সিমেট্রি-র নামান্তর ভেবে এসেছেন, তালের অন্য কোনো অর্থই ধরতে পারেননি। দীর্ঘকালের সেই ভ্রান্তির চাপে এঁদের কান নষ্ট হয়ে গেছে। এঁরা প্রায়ই সব সঙ্গীতকে জোর করে একই প্রচলিত তালে ফেলতে চান। এঁরা ভুলে যান যে, 'কর্নেল বোগী' বা 'ওয়াল্ট্‌জিং ম্যাটিলডা'-র একঘেয়ে বৈশিষ্ট্যহীন টাইম স্কীম সূক্ষ্ম অনুভবের স্পর্শে রচিত মহৎ কীর্তির ঐতিহ্যবহ তালের ওপর চাপিয়ে দিলে, তাল মারা পড়ে।

পশ্চিমী সঙ্গীতের অধ্যয়নে সচরাচর তালের যে সব নীতি প্রয়োগ করা হয়, ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের প্রয়োগবিধির আলোকে তাদের পূর্ণ মূল্যায়নে প্রবৃত্ত

হয়ে ডক্টর রেন্‌শ তাঁর ছাত্রদের বোঝাতে সমর্থ হন যে, অসমমাত্রিক তাল আমাদের সঙ্গীতে ক্ষণে ক্ষণে সহসা আবির্ভূত হয় নি, আমাদের সঙ্গীতে চিরকালই তার স্থান আছে। গুরুত্ব বিবেচনায় পশ্চিমী সঙ্গীতের সামগ্রিক চিত্রে অসমমাত্রিক তাল সমমাত্রিক তালের এতাবৎকাল প্রাপ্ত স্বীকৃতি দাবি করতে পারে।

ডক্টর রেন্‌শ মনে করেন যে, কাফী, ভৈরবী ও কল্যাণ ঠাট, অর্থাৎ পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীতের রো, মি ও ফা মোড্‌-এর গভীরতর অনুশীলনে আমাদের মধ্যযুগীয় ও রেনাইসান্‌স্ পর্বের সঙ্গীতের গভীরতর জ্ঞান লাভ সম্ভব হবে। সহস্রাধিক বৎসরকাল ধরে প্রচলিত ঐ মোড্‌গুলির মধ্যে ধর্মীয় ও অনাধ্যাত্মিক সঙ্গীতের বিরাট সম্পদ নিহিত আছে - এই সঙ্গীতের এক বিরাট অংশ শুদ্ধ unharmonized মেলডি-রূপে বর্তমান—এবং এর অস্তিত্বের কথা খুব অল্পসংখ্যক পশ্চিমী সঙ্গীতকারই জানেন। তিনি বলেন, "সপ্তদশ শতাব্দীতে মেজর ও মাইনর স্কেলের প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই এই মোড্‌গুলি লুপ্ত হয়ে যায় নি; কিন্তু সাধারণ শ্রোতারা এগুলি সম্পর্কে এত কম জানেন যে বাখ্‌ ও রাভেল্‌-এর মতো পরিচিত সুরকারের রচনা কিংবা লোকসঙ্গীতে এদের সাক্ষাৎ পেলেও এঁরা ধরতেই পারেন না, এদের প্রাপ্য সম্মানটুকুও দিতে পারেন না।"

এবার ওস্তাদ আলী আকবর খাঁ স্থির করলেন যে, এতক্ষণ ধরে তাঁর বাজানো গৎ শুনে ছাত্রেরা বিভিন্ন রূপের বৈশিষ্ট্যগুলির সঙ্গে পরিচিত হয়ে গেছেন; এবার তাঁদের কাছে আলাপ বোঝাতে হবে। প্রধানত রিদমিক ও measured সঙ্গীতের সঙ্গে পরিচিত পশ্চিমী সঙ্গীতকারদের কাছে গৎ-এর চেয়ে আলাপ দুর্বোধ্য বলে মনে হয়, কারণ এতে রিদমিক বস্তু ও তাল, উভয়ই অনুপস্থিত।

গৎগুলির সাহায্যে তাঁরা যে জ্ঞানলাভ করেছেন, সেই জ্ঞানের পথ ধরেই বিমূর্ততর আলাপের দিকে এগোতে হবে—এই ইঙ্গিত দিয়ে তিনি অস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগের ধীর ক্রমবিকাশের পরিচয় দিলেন; এতে টেজিটুরা-(tessitura)-র বিশেষ ভূমিকা আছে। জোড়-এর স্বভাবজ রিদ্‌মিক পজ্‌ (rhythmic pause)-এর পর তিনি বিলম্বিত লয়ে রাগের সমগ্র চরিত্রটি প্রকাশ করলেন—এর মধ্যে তিনি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ odd-note combinations, দীর্ঘ লহরী বা ট্রেমোলো-র কাজ প্রভৃতি নানা কলাকৌশলও পরিবেশন

করেন। শেষে ঝালার দ্রুত লয় ও প্লাকিং (plucking)-এর আশ্চর্য বৈচিত্র্যে গুণিবর তাঁর আলাপ শেষ করলেন। শ্রোতাদের মনে কোনো সন্দেহই রইল না যে, থীম্ বা তালের অন্তরায়হীন আলাপই রাগের অন্তরতম আত্মস্বরূপ।

কাফী, ভৈরবী ও কল্যাণ ঠাটের বিভিন্ন রাগের আলাপ সারা হলে, মহাপুরুষ মিশ্র একক তবলা বাদনের রীতিবদ্ধ, অসাধারণ ও স্মরণীয় এক দৃষ্টান্ত পরিবেশন করেন। বোল, তুক্রা, রেলা, পূরণ প্রভৃতি বৈচিত্র্যের লয় বিলম্বিত করে তিনি অসীম ধৈর্যে বারবার ত্রিতালের ঠেকায় ফিরে এসেছেন। ফলে, ব্ল্যাক বোর্ডে বোল পড়ে ছাত্রেরা ক্রমে ক্রমে তাঁর দ্রুততর বাদনও বুঝতে পেরেছেন। তারপর অর্ধেক স্পীড্-এ তিনি ঐ একই ধারাক্রমে বাজিয়ে শুনিয়েছেন, পরে পুরো স্পীড্-এ সবকটি বৈচিত্র্য (variation) বারবার বাজিয়েছেন। মেজাজের মাথায় তিনি আরো নতুন নতুন বৈচিত্র্য বাজিয়ে শুনিয়েছেন। ডক্টর রেন্‌শ-র অনুরোধে, তিনি দ্রুততর লয়ে সবকটি বোল আবৃত্তি করতে করতে বাজিয়ে গেছেন—একটি বোলও বদলে যায় নি। এতে প্রমাণিত হয়ে যায় যে তাঁর আঙুলের কাজে কোনো বিশৃঙ্খলা নেই, তাঁর মন সবসময়েই সমান সতর্ক। তাঁর তবলা বাদনের শেষে বিপুল অভিনন্দনধ্বনির জবাবে, ভারতীয় তবলাবাদনের কলানৈপুণ্যের কিছু পরিচয় দিতে পারার আনন্দে তিনিও মৃদুহাস্য করেন।

রূপকতাল, ঝাঁপতাল এবং বার্টক, লাগুিনো ও বাখ্-এর রচনা থেকে ৭ ও ১০ মাত্রার পশ্চিমী উদাহরণ নিয়ে কিছুক্ষণ কেটে যাবার পর অধ্যাপক খাঁ সাহেব আরেক নতুন অধ্যায় খুলে ধরলেন। পূর্বে আলোচিত কল্যাণ ঠাটের সঙ্গে ভৈরোঁ ঠাটকে (এই ঠাটের মাইনর সেকণ্ড্ ও মেজর থার্ড-এ এমন এক ক্রোমেটিক ইন্টারভাল আছে যার তুলনা পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীতে সচরাচর প্রাপ্ত স্বরগ্রামে নেই) যুক্ত করে তিনি বললেন যে, বিশেষ বিশেষ ঋতুর সঙ্গে কিংবা বিশেষ প্রহরের সঙ্গে রাগবিশেষের যোগ দীর্ঘকালের প্রয়োগের অভ্যাসে বাঁধা সুনিশ্চিত দস্তুরের ওপর প্রতিষ্ঠিত—এটা শুধু সঙ্গীতের কথা নয়, সময়ের সমগ্র চরিত্র জুড়েই তা আছে।

এই সূত্রে ডক্টর রেন্‌শ বললেন যে ডিসেম্বরে মাদ্রাজ ও বেথ্‌লিহেমের আবহাওয়া সম্ভবত একই রকম; তবু, ক্যানাডার বরফ ও এভারগ্রীনের সঙ্গে পরিচিত বলেই মাদ্রাজের সেই আসল নাতিশীতোষ্ণ পরিবেশে ২৫শে

ডিসেম্বর তাঁর কাছে কিছুতেই বড়দিন বলে মনে হয় না। আরো ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন, অনুষঙ্গের এমনই গুণ যে সর্বকালীন মহত্ত্বের আস্বাদে ধন্য হলেও বড়দিনের মরশুমের সঙ্গে জড়িত হাণ্ডেল্-এর 'মেসাইয়া' মধ্যগ্রীষ্মে বিসদৃশ ঠেকবে। শুব্যেয়র্-এর 'সেরেনেড' কেবলমাত্র তার কথার খাতিরেই, আর মোৎসার্ট্-এর 'আইনে ক্লাইনে নাখ্‌ট্‌মুজিক্' কেবল নাম মাহাত্ম্যেই 'নৈশ সঙ্গীত' বলে বিবেচিত। ঐ একই সুর অন্য গানের কথায় বসালে শুব্যেয়র্-এর গান হয়তো 'ওবাদ্' হয়ে দাঁড়াত, মোৎসার্ট্-এর স্যুইট্-এর অন্য নাম হলে হয়তো স্বচ্ছন্দে সকালের গান বলে তরে যেত।

গুণিবর তখন বলেন যে, উত্তরভারতীয় সঙ্গীতে গানের বিশেষ সময়টি কথা বা নামমাহাত্ম্যে নির্ণীত হয় না ; সেখানে কেবল সাঙ্গীতিক বৈশিষ্ট্যই বিবেচিত হয়। উদাহরণত, দিনের শুরুর দিকে রাগগুলি দ্বিতীয় ও ষষ্ঠ স্বরের ওপর জোর দেয়, পরের দিকে তৃতীয় ও সপ্তম স্বরের ওপর জোর দেয়, এইভাবেই চলে। এ নিয়মের অবশ্য ব্যতিক্রমও আছে ; অনেকগুলি রাগ সাঙ্গীতিক বৈচিত্র্যের প্রয়োজনেই সব সময়ের পক্ষেই উপযোগী। তিনি অবশ্য মেনে নেন যে, উত্তর ভারতে গানের কালোপযোগিতার প্রশ্ন যতটা গুরুত্বপূর্ণ, দক্ষিণে ততটা নয়। তথাপি তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস যে শিল্পী ও শ্রোতাদের অধিকাংশই এই দস্তুরে এত অভ্যস্ত হয়ে উঠেছেন যে তাঁদের কাছে এই রীতি উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতের ঐতিহ্যের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

আমরা তো একেবারে অন্য দস্তুরে অভ্যস্ত ; আমরা তাই অনেকেই ভেবেছিলাম যে এই তত্ত্বের যে প্রমাণ তিনি দাখিল করবেন তার তত্ত্বগত আবেদনটুকুই সার হবে। তিনি বাজালেন যোগিয়া কালাংড়া। তখন ঘড়ির কাঁটা বারোটায় পৌছয় ; কিন্তু তাঁর হাতের ছোঁয়া এত সংবেদনশীল যে আমরা প্রভাতবেলার অনুভূতি পেলাম। একটু পরেই তীব্র উজ্জ্বল রোদের মধ্যেই আমরা তাঁর শ্রী রাগের প্রগাঢ় রূপায়ণে গভীর রাত্রের রহস্য অনুভব করলাম। গুণিবর তাঁর শ্রোতাদের ওপর এমন এক ঘোর ছড়িয়ে দিলেন যে স্বয়ং ওয়র্ড্‌স্‌ওয়র্থ্-ও অপ্রত্যয়ের স্বেচ্ছাকৃত প্রত্যাহারের ততোধিক দাবি জানাতে পারতেন না।

একতাল ও চৌতাল, বারো মাত্রার এই দুটি তালে গৎ বাজিয়ে ওস্তাদ আলী আকবর খাঁ দেখান যে, পূরবী, মারওয়া, টোড়ী, ললিত প্রভৃতি ক্রোমেটিক ঠাটের অনেক রাগ, যেমন মালী, গৌড় ও গুজ্জরী-টোড়ী, টোনিক্

ও ডমিনাণ্ট্ স্বরে দ্বৈত আপোজিওটুর (appogiature)-এর বিশিষ্ট প্রয়োগ ব্যবহার করে। যে স্বর দুটি এই আপোজিওটুর-এর জনক, তাদের পাশাপাশি সমান বিশিষ্টতায় না থেকে ডো ও সোল্, অর্থাৎ সা ও পা, কিংবা ওদেরই কোনো একটির ওপরে ও নিচে দুটি অনুস্বর প্রায়ই পশ্চাদ্‌ভূমিতে অনেক পেছনে চলে যায়।

আবার পুরনো আলোচনায় ফিরে এসে অধ্যাপক খাঁ সাহেব ক্রিংতান ও গমকের কথা তুলে (এখানেও শ্রুতির পরিচয় পাওয়া যায়) বলেন যে, সুবেশী ভারতীয় রমণীর পক্ষে গহনা যেমন প্রয়োজন, কুপের‍্যা ও অন্যান্য অষ্টাদশ শতকীয় সুরকারদের কাছে অলঙ্করণ যেমন অপরিহরণীয় (এঁরা অঙ্গীগতভাবে এবং সজ্জাকল্পে, এই উভয় উদ্দেশ্যের সমাহারে অলঙ্করণ ব্যবহার করেছেন), ভারতীয় সঙ্গীতের ক্ষেত্রে এরা ঠিক তেমনই গুরুত্বপূর্ণ। এতে আরো একবার প্রমাণ পাওয়া গেল যে ভারতীয় ও পাশ্চাত্ত্য রীতির পার্থক্য প্রায়শই পরিমাণগত মাত্র। গুণিবর অতঃপর মালকোষের মতো সরল পঞ্চস্বর রাগ থেকে শুরু করে গৌরী-মঞ্জরী ও সিন্ধু-ভৈরবীর মতো জটিল এগারো ও বারো স্বরের রাগ অবধি বিস্তৃত একটি রাগমালায় আলোচনার সমগ্র চৌহদ্দি পরিক্রমণ করেন। এই রাগমালায় ব্যবহৃত একটি ফরাসী-ক্যানেডীয় লোকসুরের গৎ-এ পূর্ব-পশ্চিমী রসের আমেজ পাওয়া গেল। অধ্যাপক খাঁ এবিষয়ে ডক্টর রেন্‌শ-র সঙ্গে একমত যে, রাগমালা ভারতীয় শ্রোতাদের পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীতের কিছু কিছু মৌলিক গুণের গভীরতর অর্থগ্রহণে সহায়ক হতে পারে। তাঁরা আশা রাখেন যে মন্ট্রিল বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রীষ্ম শিক্ষাক্রমে সাফল্যমণ্ডিত 'প্রাচ্য-প্রতীচ্য নন্দনতত্ত্ব'-র অনুরূপ এক পরীক্ষার আয়োজন তাঁরা ভারতেও কোনো একদিন করে উঠতে পারবেন।

শিক্ষাক্রম শুরু হয়েছিল বিলাবল্ ঠাটের আলোচনায় ; সবশেষে রাগের কথা। এক্ষেত্রেও রাগের সংজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতীয় ও পশ্চিমী সঙ্গীতকারেরা নিজেদের আরো কাছাকাছি মনে করলেন। ভাগ্‌নারের অপেরার কাহিনী না জেনেও ওস্তাদ আলী আকবর খাঁ সহজেই 'ডাই মাইস্টারসিঙ্গার'-এর ওভার্চার্ এবং 'ট্রিস্টান উণ্ড্ ইজোলডে'-র প্রিলিউডের মেজাজের পার্থক্য অনুভব করতে পারেন। বীঠোভেন্-এর সপ্তম সিম্ফনির শুরুর মুভমেণ্ট মেজর কী-তে এবং নবম সিম্ফনির শুরুর মুভমেণ্ট মাইনর কী-তে, একথা তাঁকে না বলা হলেও তিনি

সঙ্গে সঙ্গে দুটি রচনার বিশেষ মেজাজ ধরতে পারেন। মোড-এর বৈপরিত্যও যেখানে নেই, সেখানেও, জে. এস্. বাখ্-এর 'ওয়েল্-টেম্পার্ড ক্লেভিয়ার'-এর একাদশ মুড-এর ডি মেজর প্রিলিউড ও বি ফ্ল্যাট মেজর ফিউগ্-এর বিপরীত চরিত্রও তিনি ধরতে পারেন।

একইভাবে ছাত্রেরাও শুদ্ধভৈরবী রাগের আশাহীন বিষাদ অনুভব করতে পারেন, যেমন স্পষ্টভাবে তাঁরা পারেন বীঠোভেন্-এর তৃতীয় সিমফনির স্লো মুভমেণ্ট ফিউনেরাল মার্চে; রূপ অপরিবর্তিত থাকলেও তাঁরা ভক্তি রসের অনুভূতি লাভ করেন, যে অনুভূতি তাঁরা পান প্যালেষ্ট্রিনা মোটেট্স্-এ। অধ্যাপক খাঁ বলেন, ধ্রুপদী সঙ্গীতে উপস্থিত থাকলেও শৃঙ্গার রস ঠুংরী অঙ্গেরই প্রাণস্বরূপ। এই রসের উদাহরণে তিনি শুদ্ধ ঈ স্কেলের পরিবর্তে আরো ক্রোমেটিক সিন্ধু ভৈরবী রাগ ব্যবহার করেন; ছাত্রেরা এর মধ্যে শুবোয়র-এর 'মোমেণ্টস্ মিউজিকো' ও শোপ্যাঁ-র বহু 'নক্টার্ণ'-এর রোমাণ্টিক স্পর্শ শুনতে পান। সব শেষে চোদ্দ মাত্রার ধামার তালে নিবদ্ধ গুজ্জরী টোড়ী রাগের স্তম্ভিত করে দেওয়া পরিবেশনায় ছাত্ররা বীর রসের স্পষ্ট আস্বাদ পান; যে আস্বাদ তাঁরা পেয়েছেন ভের্দি-র 'আইডা'-র ভিক্টরি হিম-এ। যে বাখ্-এর কীর্তি পশ্চিমী সঙ্গীতের বেদগ্রন্থ স্বরূপ, সেই বাখ্-এর রচনায় এবং লা জুন ও মোৎসার্ট-এর রচনায় ডক্টর রেন্‌শ চোদ্দ মাত্রার তালের দৃষ্টান্ত দেখান। অতঃপর গুরু ও ছাত্রেরা ভারতীয় ও পশ্চিমী সঙ্গীতের নানা রসের উদাহরণ নিয়ে আলোচনা করেন।

ক্যানেডিয়ান ব্রডকাষ্টিং কর্পোরেশন ও ক্যানাডার ন্যাশনাল ফিল্ম বোর্ডের কর্তৃস্থানীয় প্রতিনিধিবৃন্দসহ সঙ্গীতজগতের অনেক গণ্যমান্য অতিথিই পর্যবেক্ষক হিসেবে শিক্ষাক্রমের কোনো কোনো অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। তাই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রাচ্য-প্রতীচ্য নন্দনতত্ত্ব শিক্ষাক্রমের শেষ অধিবেশনে ইউনেস্কোর ক্যানেডীয় জাতীয় কমিশনের সহ-সভানেত্রী শ্রীমতী এ. পারাডিস্‌কে সাদর আমন্ত্রণ জানান।

ওস্তাদ আলী আকবর খাঁর সঙ্গীতানুষ্ঠান এই অধিবেশনের আকর্ষণ। এই পূর্ণাঙ্গ অনুষ্ঠানটি অধিকাংশ সিম্‌ফনি বা কনসারটো-র চেয়ে বেশি সময় নেয়। তবু যে মনোযোগী শ্রোতারা সযত্ন-বিকশিত আলাপ ও সুসংবদ্ধ গৎগুলির প্রতি পর্ব অনুধাবন করেছেন, দীর্ঘকাল তাঁদের কাছে দীর্ঘ বোধ হয় নি। সেই সঙ্গীত মনকে এমনভাবে বেঁধে রাখে, তার সমাপ্তি এমন অভিভূত

করে যে আঙুলের শেষ কাজটি শেষ হতে না হতে সকলে দাঁড়িয়ে উঠে শিল্পী ও তাঁর সঙ্গতিয়াকে বিপুলভাবে অভিনন্দিত করেন।

দীর্ঘক্ষণ ধরে স্পন্দিত সেই অভিনন্দনধ্বনি শান্ত হলে ইউনেস্কোর প্রতিনিধির চোখ দুটি অনুষ্ঠানের আশ্চর্য সার্থকতার আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এটিকে "দেবদর্শন"স্বরূপ বলে বর্ণনা করে তিনি বলেন যে, ভোজনান্তিক ভাষণের মামুলি মন্তব্য বিনিময় এখানে ঘটে নি; এখানে পূর্ব-পশ্চিমের যে গভীর মিলন রচিত হয়েছে, তার মূল্য চিরকালীন, সরকারী তরফের স্বীকৃতি ও উৎসাহও তার প্রাপ্য।

যে বিদায়ী ভোজে গ্রীষ্ম শিক্ষাক্রমের সমাপ্তি ঘটল, সেখানে ছাত্রেরা ভারতের বহুশতবর্ষের প্রাচীন সংস্কৃতি, ওস্তাদজীর বহুমানভাজন পিতৃদেব পদ্মভূষণ ডক্টর আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের প্রতিভা এবং তাঁর পুত্রের অনন্যসাধারণ সাধনার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন। যে গভীর শ্রদ্ধা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, তারই চিহ্নস্বরূপ তাঁরা গুণিবরকে, তাঁর সঙ্গতিয়াকে এবং ডক্টর রেন্‌শ-কে ধর্মীয় স্মারক চিহ্ন উপহার দেন।

অভিনন্দন ও শুভেচ্ছার উত্তরে অধ্যাপক খাঁ তাঁদের এই মর্মে উপদেশ দেন যে, তাঁরা যা শিখলেন তার চর্চা যেন অব্যাহত রাখেন। সেই শিক্ষা যেন তাঁদের ছাত্রদের মধ্যে ছড়িয়ে দেন। তিনি বলেন, "আপনারা যদি আপনাদের দায়িত্বের অংশ পালন করেন, তবে দেখবেন, আমরা এই গ্রীষ্মে যে বীজ বপণ করলাম, সেই বীজ কালে কুসুমিত হয়ে উঠবে, সারা বিশ্ব জুড়ে তার শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে দেবে, শত শত বর্ষ ধরে তা বেঁচে থাকবে।" তাঁদের আরো একবার ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি বলেন, "আর যা বলার ছিল সবই তো সুরের মধ্যেই বলে দিয়েছি।" তাঁর সঙ্গীত সম্পর্কে এর চেয়ে বড় আর কোনো সত্য নেই। তাঁর সঙ্গীত এক হৃদয়ের গভীর থেকে উঠে অন্যদের হৃদয়ের গভীরে গিয়ে পৌঁছেচে, অতুল বাঙ্ময় এক ভাষায় প্রকাশ করেছে যে আমরা সকলে একই মানব পরিবারের সভ্য।

ভারতের কাছ থেকে যে প্রসাদধন্য শৈল্পিক ও মানবিক অভিজ্ঞতা তিনি লাভ করেছেন, এই সহৃদয় গোষ্ঠীর সঙ্গে সেই অভিজ্ঞতার অংশ বিনিময়ের সুযোগলাভে আনন্দ প্রকাশ করে ডক্টর রেন্‌শ বলেন যে, যাত্রী যখন বিদেশ থেকে ফিরে আসে, তখন সে স্বদেশকেই আরো ভালো করে চেনে, এ কথা তো সর্বজনীন সত্য। তাই, তাঁর মনে হয়, ভারতের সঙ্গীতের বিশাল প্রান্তরে

ছাত্রেরা যে ক্ষণকালের সঙ্গের সুযোগ পেয়েছেন, তার ফলে সেই সঙ্গীতরীতি যখন তাঁরা আরো ভালোভাবে বুঝবেন, তখন পাশ্চাত্ত্যের সঙ্গীত সম্পর্কে তাঁদের বোধ প্রসারিত হবে, গভীরতর হবে। শ্রীমতী রেন্‌শ তাঁদের স্মরণ করিয়ে দেন, "যে মন ভাবে, আর যে হৃদয় অনুভব করে, তারা তো মানুষেরই; পূবে পশ্চিমে তারা তো একই।"

পরিশেষে, মণ্ট্রীল বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গীত পরিবারের প্রত্যেকের আশাকে বাণী রূপ দিয়ে ডক্টর রেন্‌শ ওস্তাদ আলী আকবর খাঁকে বল্লেন, "আবার আসবেন, অচিরে আসবেন, বারবার আসবেন।"

* মণ্ট্রীল বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি অফ মিউজিকের ডীন রেভারেণ্ড ক্লীমেণ্ট মোরিণ লিখিত এই বিবরণমূলক নিবন্ধটির বাংলা ভাষান্তর করেছেন শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়—সম্পাদক।

জাকোমো লেওপার্দি : সাহিত্য জিজ্ঞাসা

অমল হালদার

ইতালীয় কবি জাকোমো লেওপার্দিকে তাঁর স্বদেশবাসী স্থান দেয় মহাকবি দান্তের পরেই। লেওপার্দি প্রধানত নির্জনতা ও নৈরাশ্যের কবি। কিন্তু এমন কবিতা শুধু ইতালীয় সাহিত্যে কেন পৃথিবীর সাহিত্যেও কম আছে।

নৈরাশ্যপ্রিয় লেওপার্দির কবিতা জগৎপ্রিয় ইতালিবাসী ধর্মীয়-শ্রদ্ধা নিয়ে পড়ে। আপাতদৃষ্টিতে এটা বিরোধ মনে হলেও এই শ্রদ্ধার কারণ আছে। স্বদেশবাসীর কাছে তিনি শুধু নৈরাশ্যবাদীই নন, তিনি স্বদেশ-প্রেমেরও জলন্ত প্রতিমূর্তি। তাঁর কাব্য-সাধনা সেই সময়ে যখন খণ্ডিত বিচ্ছিন্ন ইতালী শুধু একটি ভৌগোলিক নাম মাত্র, যখন সে জাতীয় ঐক্যের জন্যে পাগল, যখন ইতালির ভাবনেতা মাৎসিনির নেতৃত্বে সংগ্রামীদল দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত বিদ্রোহ প্রচার করে বেড়াচ্ছে, যখন ১৮৩০-এর ফরাসী বিপ্লবের বৈদ্যুতিক প্রবাহে সমগ্র দেশ আত্মচেতনায় জেগে উঠেছে। সেই আবেগ-বহ্নির ইন্ধন জুগিয়েছেন লেওপার্দি। 'ইল বিসর্জিমেন্তো' (জাগরণ) 'আল ইতালীয়া' (ইতালীর প্রতি) প্রভৃতি তাঁর কবিতা ছিল ইতালীয় মুক্তি-সংগ্রামের 'বন্দেমাতরম্'। তাই বঙ্কিমকে আমরা যেমন জাতীয়তাবাদের দীক্ষাগুরু বলে জানি, ইতালীয়দের কাছে লেওপার্দিও তেমনি এক শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিত। যেমন দান্তের কাব্য। 'দিভিনা কম্মোদিয়া' শুধু স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালের রহস্যময় বিবরণই নয়, ইতালীয়দের জাতীয় চেতনায়ও উদ্বুদ্ধ করেছে এই মহৎ কাব্য। এইখানেই দান্তের সঙ্গে লেওপার্দির মিল।

কিন্তু অমিলও অনেক। সেটা জগতের চোখে। চরম একটা নৈরাশ্যবাদ, জীবনের প্রতি এক গভীর বেদনাবোধের জন্য লেওপার্দি পৃথিবীর কাছে পরিচিত। নিয়তির অমোঘ প্রভাবে জীবনের যে একটি নিদারুণ ট্র্যাজেডি আছে, তারই রূপ তাঁর কাব্যে ধ্বনিত হয়ে চিরদিন মানবমন আকৃষ্ট করেছে।

ইতিহাসে ট্র্যাজিক কবি অনেক আছেন, কিন্তু লেওপার্দির মতো জীবনভরা

ট্র্যাজেডি অল্পই দেখা গেছে। প্রথম জীবনে বিকলাঙ্গের লজ্জার সঙ্গে যখন এসে মিলল অত্যধিক পড়াশুনোয় চোখ অন্ধপ্রায় হয়ে যাওয়ার হতাশা ও যন্ত্রণা, তখন থেকেই এই ট্র্যাজেডির সুরু। গৃহের অশান্তি আর ব্যর্থ প্রেমের জ্বালায় তার পরিপুষ্টি। নিঃসঙ্গ মৃত্যুতে এর করুণ পরিসমাপ্তি। মাত্র উনচল্লিশ বছর বেঁচেছিলেন লেওপার্দি (১৭৯৮—১৮৩৭)। বালক বয়েসের অজ্ঞানতা পেরিয়ে স্বস্তি পান নি কোনোদিন। ভগ্ন দেহে, ভগ্ন মনে ইতালির এধার থেকে ওধার ঘুরে বেড়িয়েছেন অতৃপ্ত আত্মার মতো। দেখেছেন জীবনের সম্ভাবনা, পৃথিবীর সৌন্দর্য ; আবার দেখেছেন জীবন ও পৃথিবী কত অনিত্য। তখন মৃত্যুকে কামনা করেছেন বারবার। করেছেন মুক্তির জন্য। তাঁর কাব্যে তাই শুধু নৈরাশ্য নয়, এক ধরণের উপলব্ধির গাম্ভীর্যও আছে।

এ নৈরাশ্য অনেকটা আদর্শগতও। পুণ্য, ন্যায়, প্রেম, সুখের যে আদর্শ তাঁর মনে ধ্রুবতারার মতো স্থির ছিল, বাস্তব জীবনে তাদের দেখলেন কক্ষচ্যুত। দেখলেন মূল্য নেই সে আদর্শের, তা শুধু কল্পনার প্রতারণা, করুণ মরীচিকা। আদর্শের জয় এ জীবনে নয়, দুঃখ তাই অনিবার্য। ফলে নৈরাশ্যই অমোঘ দর্শন। ভগবান কি আছেন? বলি কি করে! প্রকৃতি? তার ছায়ায়, তার সৌন্দর্যে কি শান্তি আছে? তাই বা কি করে বলি? মানুষের সুখে দুঃখে যার প্রত্যক্ষ অপ্রত্যক্ষ কোনো যোগ নেই, সে তাকে সান্ত্বনা দেবে কি করে? এই বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড যার রঙ্গমঞ্চ, সেখানে মানুষ কি? ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় যার কাজ, তার কাছে ক্ষুদ্র মানুষের ক্ষুদ্র ট্র্যাজেডির প্রাপ্য কি? উপেক্ষা। তাই বাঁচার চেয়ে না বাঁচাতেই শান্তি।

১৮১৯ থেকে ১৮২১ পর্যন্ত লেওপার্দি যে সব কবিতা লেখেন তাতে এ-ধরণের চিন্তাই প্রবল। 'প্যাস্সেরো সলিভারিও' (নিঃসঙ্গ চড়ুই) 'সেরা দেল দী দি ফেস্তা' (উৎসব-সন্ধ্যা) প্রভৃতি কবিতায় তিনি ব্যক্তিগত বেদনার সঙ্গে মিলিয়েছেন বিরাট বিশ্বে দুঃখের অনন্ত প্রয়োজনীয়তাকে। আকাশে বাতাসে বসন্তের স্পর্শ। উপত্যকায় অখণ্ড সংহতি। শূন্যে পাক দিয়ে উড়ে বেড়ায় কত পাখি। দিক-বিদিক থেকে আসে কত কি ডাক। চারিদিকে উৎসব-চঞ্চলতা। এর মধ্যে একটি চড়ুই নিঃসঙ্গ। ঘুরে বেড়ায় একাকী। গান গায় যতক্ষণ না দিনের শেষ মুহূর্তটুকু পর্যন্ত মিলিয়ে যায় রাত্রির অন্ধকারে। আর নিজের মনে দূরের থেকে চেয়ে চেয়ে দেখে সব কিছু। বছরের ফুলের ঋতু ফুরিয়ে যায় গ্রীষ্মে, সেই সঙ্গে জীবনেরও। কবি বলছেন :

"ওগো পাখি, আমিও যে তোমার মতন!
প্রথম যৌবনের হাসি আমোদ
আর প্রেমের দীর্ঘ দাপানো দিনগুলি
কেমন যেন অপরিচিত।
আমি যেন দূরে সরে যাচ্ছি—অনেক দূরে…
স্তব্ধতার মধ্যে ভেসে আসে কিসের শব্দ…

উৎসবের পোষাক পরে
যৌবন আজ বেরিয়ে এসেছে বাইরে,
পথে-পথে আনন্দ-বাতাস
হৃদয়ে খুশির ধারাজল।
আমি শুধু একা।
বসে আছি এত দূরে নির্জন নিবিড়।
দূরে পাহাড়ের-কোলে সূর্য ডুবে যায়,
ডুবে যায় চোখের পাতায়,
বলে যায় যৌবন বিদায়।…"

'উৎসব-সন্ধ্যা'তেও পার্থিব অনিত্যতার জন্যে করুণ বিলাপ :

"থেমে গেছে পথে শ্রমিকের গান।
তোলপাড় করে কান্না তুফান
ফুরায় পৃথিবী, ফুরায় জীবন
রাখে না তো পদচিহ্ন ;
কালের প্রবাহে ভেসে যায় যায়,
কোনো কিছু নয় ভিন্ন।"

'উলতি-মো-কান্তো দি সাফ্যো' (সাফোর শেষ গান) কবিতায় তিনি দেখিয়েছেন প্রতিকূল শান্তির প্রভাবে পুণ্যের আদর্শ কিভাবে পর্যুদস্ত। প্রকৃতি সুন্দরী কিন্তু নির্দয়া। মানুষকে দূরে রাখতে চায় ঠেলে। আর করতে চায় অপ্রতিরোধনীয় দুর্দশায় জর্জরিত। প্রকৃতির নেশাই যেন তাই।

"আমরা মরব।
ধরার ওপর থেকে সরে যাবে
অর্থহীন এই আবরণ

আত্মাকে নগ্ন করে দিয়ে চলে যাবে
প্লুটোর প্রদেশে
উঁকি দেয় জরা ব্যাধি মৃত্যুর—
হিমশীতল ছায়া।
এত আশা, গৌরব আর আনন্দের
দু-চারটি ভুল,
তারি জন্যে এই প্রতিশোধ?"

প্রতিশোধ? আগে তাই মনে হতো বটে। কিন্তু এখন? এখন মনে হয় মৃত্যু বুঝি মুক্তির দূত। এই জরা, এই ব্যাধি, এই অবশ্যম্ভাবী ট্র্যাজেডির হাত থেকে মুক্তি। লেওপার্দির কবিতার প্রথম দিকে দেখি মৃত্যু সেখানে ভগ্নদূতের মতো উপস্থিত। জীবনের যা কিছু সুন্দর, যা কিছু শ্রেয়, যা কিছু প্রেয় নিষ্ঠুর হাতে তা ভেঙে ভেঙে দেওয়াই যেন তার একমাত্র কাজ। কিন্তু শেষের দিকে, বিশেষ করে 'আমোরে এ মর্তে' (প্রেম ও মৃত্যু) কবিতায় এ ধারণা উল্টে গেছে। এখন জীবন প্রেয় নয়, জীবনের সৌকুমার্যকে যে প্রতিক্ষণে ধ্বংস করে দিচ্ছে, সেই মৃত্যুই এখন লেওপার্দির কাম্য। জীবন তাঁকে সার্থকতা দেয়নি, পৃথিবী তাঁকে শুধু লাঞ্ছিত করেছে। এখন তাই আশা, যদি মৃত্যুর মধ্যে এই অনন্ত বিপাক থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। একটি গদ্য রচনায় কবি বলেছেন: "সভ্য পৃথিবী তোমাকে চায়, ওগো মৃত্যু! তুমি অসাধারণ। তোমার যে দান, সে তোমারই। নবীন উৎসাহের উষ্ণ প্রলেপ, নৈরাশ্যের হিমশীতল বেদনা, সে কি আর কেউ দিতে পারে? পৃথিবী পাগল হয়ে খুঁজেছে নতুন সভ্যতার নির্দেশ, লক্ষ্য তার সর্বোৎকর্ষের দিকে। কিন্তু তুমি অচঞ্চল চিরস্থায়ী। তোমার জয় হোক!"

মৃত্যু সত্য। প্রেমও সত্য। এই বিশ্বব্যাপী ধ্বংসলীলার মধ্যে আনন্দের এই আয়োজন কেন? ইচ্ছার আগুনে পুড়িয়ে মারবার জন্যে? তা নয়। তবে? আমাদের চোখে দু ফোঁটা জলের সমারোহ আনতে। বিদায়ের প্রতীক এই চোখের জল। চোখের জলেই আমরা ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা হই, উপলব্ধি করি মৃত্যুর সত্যতা। আর আমাদের মনের কোণে অলক্ষ্য উপস্থিতির মতো যে মৃত্যু চিন্তা রয়েছে, তারই গুণে আমাদের প্রেমে এত উত্তাপ, এত গভীরতা। এই উত্তাপ আর গভীরতাই তাকে সত্য করে তুলেছে। তাই মৃত্যু সত্য, প্রেমও।

প্রেম ও মৃত্যুর আগে 'আ সিলভিয়া' (সিলভিয়ার প্রতি) একটি পরম সুন্দর কবিতা। প্রেম ও মৃত্যুর সঙ্গে বিরোধ কবি কখনো কাটিয়ে উঠতে পারেন নি:

"ফুরিয়ে এসেছে আশা,
যৌবনের সুখস্বপ্ন
জাগো নাতো আর।
অশ্রুসিক্ত হে চাওয়া আমার,
তুমি কি গিয়েছ চলে?
এই বুঝি এ পৃথিবী?
এই সুখ, এই কাজ, এই প্রেম, এই ভালোবাসা?···
এই কি মানব-ভাগ্য?
সত্যের উদয় কালে তুমি চলে গেছ,
দূর থেকে দেখিয়েছ
একটি শীতল মৃত্যু আর—
একটি নগ্ন কবর।"

কিন্তু 'প্রেম ও মৃত্যু'তে আমরা দেখি ঠিক এর উল্টো ধারণা—

"আমার ভাবনা একে একে নিঃশেষ,
হৃদয় জুড়ে তোমার ভাবনা শুধু।
আছি সেদিনের প্রতীক্ষায়
যেদিন নিশ্চিন্ত মনে আমার ক্লান্ত মুখখানি
তোমার কুমারী বুকের গোপন আড়ালে
পড়বে ঘুমিয়ে।"

মৃত্যুর এই স্বীকৃতি নৈরাশ্যবাদীর শেষ অবলম্বন নয়। জীবন ও জগতের একটা উদ্দেশ্য খোজার প্রবল প্রয়োজন থেকে এর উৎপত্তি। লেওপার্দি জীবনের একটা অর্থ মৃত্যুর মধ্যে খুঁজে পেয়েছিলেন। কিন্তু এও জেনেছিলেন, মৃত্যুর পরপার অনিশ্চিত। পার্থিব জীবন অনিত্য হলেও সুখে-দুঃখে হাসি-কান্নায় মিলনে-বিরহে সমুজ্জ্বল। এর সঙ্গে যে তাঁর নাড়ির যোগ। একে কি ভোলা যায়? অন্তত যিনি কবি, দার্শনিক—নৈরাশ্যবাদী নন, তিনি কি ভুলতে পারেন? তাই আমরা শেষ পর্যন্ত তাঁর কাব্যে দেখি, ঠিক পৃথিবী প্রীতি না হলেও পার্থিব জীবনের চিন্তায় একটা বেদনাময় আকুল ক্রন্দন।

'ইল ত্রামন্ত দেল্লা লুনা' (অস্তগামী চাঁদ) শেষ রাত্রির চাঁদের মতো একটা করুণ গাম্ভীর্যের রূপ পেয়েছে। এই কবিতার শেষ কটি লাইন তাঁর মৃত্যুর ছ ঘণ্টা আগে লেখা। তাই সে কটি লাইনের চিন্তাধারাকে আমরা শেষ নয় চরমতম অনুধ্যান বলেই ধরে নিতে পারি। তিনি বলেছেন :

"ওগো পাহাড়, ছোট পাহাড়
আর তুমি সমুদ্রের কূল !
নিভে গেছে সেই জ্যোতি পশ্চিম-আশায়
রাত্রির আঁধার পর্দা আলো করে দিয়েছিল যেবা।
অনাথ তোমরা তবু চেয়ো না বিশ্রাম।
আর তো কিছু পরে অন্য দিক পানে
আকাশ আলোয় সাদা, ফুটবে প্রভাত :
দিগন্তসীমার পারে উঁকি দেবে রোদ,
তীব্র আগুনে তার প্রজ্বলিত হবে দশ দিক,
ভাসমান আলোকের প্রচণ্ড প্রবাহে
আকাশ বায়ুর যত ইথারীয় মাঠ।
কিন্তু মর এ জীবন, যৌবনের অবসানে হায়,
সে রঙে হবে না রাঙা, সে আলোকে নয়।
অন্তিম সময়বধি বিধবা যে চিরকাল তরে ;
রাত্রির আঁধার কালো, কারো জানি সীমা
কবরের অন্তহীন গুহার ভিতরে।"

তৎকালীন ইতালি ও তাঁর জীবনের বিশেষ অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতেই লেওপার্দি বিচার্য। তাঁর জীবনবোধ ও হতাশা বিচার্য। এবং বাংলা ভাষায় প্রায় অপরিচিত এই কবির প্রতি পাঠকসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যই লেওপার্দি সম্পর্কে এই সংক্ষিপ্ত পরিচিতির অবতারণা।

কবিতাগুলি মূল ইতালীয়ান থেকে অনূদিত। লেওপার্দির কবিতা কোনো কোনো বিদেশী ভাষায় অনূদিত হয়েছে। বর্তমান অনুবাদে মূল কবিতার সূক্ষ্মতা ও সৌন্দর্য সর্বত্র রক্ষা করা যায় নি, একথা বলাই বাহুল্য—লেখক।

একটি রাজপথ : তমসায় ও আলোয়

অমল দাশগুপ্ত

শিল্পে ও সংস্কৃতিতে উন্নত মধ্য ইওরোপের একটি দেশের ইতিহাস একদা ঘন তমসায় লুপ্ত হয়েছিল। ১৯৩৩ সালের ৩০শে জানুয়ারি তারিখটি ছিল বর্তমান যুগের এই চরমতম দুর্বিপাকের আনুষ্ঠানিক ক্ষমতা লাভের দিন। আডোল্‌ফ্‌ হিটলার এই দিনটিতেই জার্মানির চ্যান্সেলার হয়েছিলেন।

কিন্তু স্বয়ং ইতিহাসই যে এই দুর্বিপাকের বিরুদ্ধে গোপনে অস্ত্র শাণিয়েছিল তা সেদিন জানা যায় নি। জানার কোনো উপায়ও ছিল না। কারণ সেদিন এই দেশটির বিস্তৃত সীমান্তে কোথাও এমন একটি ছিদ্র ছিল না যা দিয়ে ইতিহাসের এই গোপন প্রস্তুতির খবর বাইরে এসে আশ্বাসের বাণী শোনাতে পারত।

তবুও এই দেশটির একটি রাজধানী ছিল যার নাম বার্লিন। বার্লিনের শ্রমিক-এলাকার একটি রাস্তা ছিল যার নাম ভালষ্টাস্‌সে। এই রাস্তাতেই আজ থেকে প্রায় ত্রিশ বছর আগে—১৯৩৩ সালের ২২শে জানুয়ারি তারিখে—পঞ্চাশ হাজার পুলিশের পাহারায় নাৎসী আয়োজিত একটি মিছিল বেরিয়েছিল। এই ছিল কৃষ্ণ-যবনিকার সূত্রপাত। মিছিলের সদম্ভ হুঙ্কার ভালষ্টাস্‌সের টুঁটি টিপে ধরতে চেয়েছিল আর রাস্তার দু-পাশের বন্ধ জানলার আড়ালে আশ্রয় নিয়ে ভালষ্টাস্‌সের জীবন কোনো রকমে অস্তিত্বটুকু টিকিয়ে রাখতে পেরেছিল মাত্র। তারপরে ২৫শে জানুয়ারি তারিখে এই রাস্তাতেই আবার শোনা গিয়েছিল আর একটি মিছিলের পদধ্বনি। আর শোনা গিয়েছিল একটি গানের সুর, যে গান সারা পৃথিবীর শ্রমিকের। এই গানের সুর জানলায় জমে থাকা তুষারকে গলিয়ে দিয়েছিল আর ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল ভালষ্টাস্‌সের মানুষ। পুলিশের শাসানি এই মিছিলের গতিরোধ করতে পারে নি। জার্মানির ইতিহাসে এই ছিল শেষ আলোর দীপ্ত

রেখাপাত। তারপরে পুরো বারোটি বছর, অর্থাৎ একটি যুগ, জার্মানির ইতিহাস কালো অন্ধকারে মুখ লুকিয়েছিল।

তবে ভালস্ট্রাস্‌সের সৌভাগ্য এই যে ধুলোয় আঁকা লক্ষ পদচিহ্ন মুছে যাবার পরেও একজন যুগচেতনাসম্পন্ন সাহিত্যিকের গোপন ও দুঃসাহসিক প্রয়াস রাত্রির অন্ধকারে অতন্দ্র থেকেছে। ফলে, ভাল্‌স্ট্রাস্‌সেকে ঘিরে আঠারো মাস ধরে যে সর্বগ্রাসী ঘটনার আবর্ত জেগেছিল, তা চিরকালের মতো হারিয়ে যায় নি, অনেক বাধাবিপত্তি পেরিয়ে নতুন দিনের আলোয় স্নাত হয়ে আমাদের হাতে পৌছেচে। এই সাহিত্যিকের নাম জান্‌ পেট্যারজেন, যাঁর সাহিত্যকৃতি বর্তমান গণতান্ত্রিক জার্মানিতে নানা পদকে ও সম্মানে উচ্চকণ্ঠে স্বীকৃত। ন' বছর ধরে তিনি ছিলেন এই রাস্তারই মানুষ এবং ফ্যাশিস্ট-বিরোধী আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী। তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় এই আন্দোলনের যতটুকু অংশ ধরা পড়েছিল তাই নিয়েই তিনি ফ্রণ্ট লাইনের সৈনিকের মতো নির্মম সরলতায় ও প্রায় রোজনামচার ভঙ্গিতে এক অসামান্য সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। তবে স্বভাবতই সব কিছু খোলাখুলি লিখতে পারেন নি। প্রতিটি লাইনে সতর্কতার প্রলেপ দিতে হয়েছিল যেন গেস্টাপোর নৃশংস থাবা কোনোক্রমে লাইনটিকে নাগালের মধ্যে পেলেও আয়ত্তের মধ্যে না পায়। অর্থাৎ, প্রতি মুহূর্তে আশঙ্কায় থাকতে হত যে গেস্টাপোর অতর্কিত হামলায় পাণ্ডুলিপি না ধরা পড়ে। এই কারণেই পাণ্ডুলিপিকে এমন ভাষায় লিখতে হত যার সত্যিকারের অর্থটি থাকত প্রচ্ছন্ন।

ফলে ভাল্‌স্ট্রাস্‌সের কাহিনীর মতো এই পাণ্ডুলিপিটিরও নিজস্ব একটি কাহিনী গড়ে উঠেছে। ১৯৩৩ সালের ২১শে জানুয়ারি কাহিনীর শুরু আর ১৯৩৪ সালের ১৫ই জুন কাহিনীর শেষ। ভাল্‌স্ট্রাস্‌সে কেন্দ্রায়িত এই কাহিনীর ক্ষেত্র বিশেষ একটি এলাকার বাইরে প্রসারিত নয়। কিন্তু এই সীমাবদ্ধ এলাকায় সীমাবদ্ধ সময়ের মধ্যে ইতিহাসের আলোড়ন যত সামান্যই হোক না কেন, মহৎ তাৎপর্যের জন্যেই তা উপন্যাসের উপজীব্য। তবুও প্রায় তিনশো পৃষ্ঠার যে ইতিবৃত্তটি আমাদের হাতে এসেছে তা শুধুই উপন্যাস নয়, তা ছাড়াও আরো কিছু। জান পেট্যারজেন বলেছেন—"ঘটনাগুলো যেমন ঘটেছে আমি লিখে গিয়েছি।" এই অতি-সরল বিবৃতি থেকে অবশ্য বোঝা সম্ভব নয় ঘটনাগুলোকে দেখা ছিল কতখানি দুরূহ, আর লেখা আরো কতখানি। ভাল্‌স্ট্রাস্‌সে থেকে মিনিট দশেকের হাঁটা পথে

ছোট্ট একটি কুঠরিতে বসে গেস্টাপো ও ঝটিকা-বাহিনীর সদম্ভ তোলপাড়কে অগ্রাহ্য করে এই ইতিবৃত্তের রচনা। আবার, ঘটনাগুলো যেমন ঘটেছে তেমনি লিখে যাওয়া বলেই রচনাটি পাঠ করার সময়ে মনে হয়, অতীতের এক খণ্ডকালের মধ্যে যেন বিচরণ করছি। আর এই খণ্ডকালের পটভূমিতে দাঁড়িয়ে শহীদের জীবনদানে, শহীদের মায়ের অশ্রুপাতে আর সংগ্রামী সৈনিকের নির্ভীক পদক্ষেপে কখন যেন আমাদের পাঠকসত্তার অস্তিত্ব লোপ পায়। আর তখন আমরাই রাত্রির অন্ধকারে চোরা-কুঠরিতে বসে বেআইনী ইস্তাহার ছাপাই, গেস্টাপোর শত অত্যাচারেও মুখ বুজে থাকি আর আকাশের দিকে মুঠি তুলে অঙ্গীকার জানাই যে শহীদের মৃত্যুর শোধ আমরা নেব। এই আশ্চর্য অভিজ্ঞতা মাত্র তিনশো পৃষ্ঠার একটি বইয়ের কালো হরফে বিধৃত হয়ে আছে।

আর এই তিনশোটি পৃষ্ঠার অভিযানও কম রোমাঞ্চকর নয়।

১৯৩৪ সালের শরৎকালে এই রচনার টাইপ-করা কপি প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল। একটি নয়, তিনটি কপি। দুটি কপিকে ওয়াটারপ্রুফ প্যাকেটে মুড়ে দুটি পৃথক জায়গায় মাটির নিচে পুঁতে রাখা হয়। আর অবশিষ্ট কপিটিকে গোপন পথে পাঠানো হয় হামবুর্গে আর ব্যবস্থা করা হয় যে একজন অজ্ঞাত-পরিচয় জার্মান নাবিক এই কপিটিকে ইংলণ্ডে পৌছে দেবে। কিন্তু এই ব্যবস্থাটি কার্যকর হয় নি। অনেক সপ্তাহ পরে খবর আসে যে জাহাজটি বন্দরে থাকার সময়েই শেষ মুহূর্তের তল্লাসী এড়াবার জন্যে পাণ্ডুলিপির সলিল-সমাধি হয়েছে।

অতঃপর দ্বিতীয় কপির যাত্রা শুরু। প্রথমে বিশ্বস্ত বন্ধুদের হাতে ড্রেসডেন পর্যন্ত। কথা ছিল ড্রেসডেন থেকে গোপন পথে চেকোশ্লোভাকিয়ায় পাচার করা হবে। কিন্তু কয়েক মাস অপেক্ষা করার পরেও যখন আর কোনো সংবাদ পাওয়া গেল না তখন ধরে নেওয়া হল যে এই কপিটিরও অপমৃত্যু হয়েছে। অতঃপর শেষ কপি। এবারে যাত্রার সঙ্গী হলেন লেখক নিজেই। ১৯৩৪ সালের খ্রীষ্টমাসের ছুটির সময়ে লেখক আর তাঁর একজন সঙ্গী ধড়াচূড়া পরে স্কীয়িং-এর সাজসরঞ্জাম নিয়ে হাজির হলেন নাৎসী জার্মানির সীমান্তে। লেখকের কাঁধের ঝোলায় ছিল পাঁউরুটি, তারই মধ্যে লুকনো ছিল পাণ্ডুলিপির শেষ কপি। সীমান্তের নাৎসী প্রহরীদের চোখে ধুলো দিয়ে দুজনে শেষ পর্যন্ত হাজির হলেন প্রাগে। সেখানে তাঁরা শুনলেন যে পাণ্ডুলিপির দ্বিতীয় কপিটি

লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় নি। ১৯৩৫ সালের এপ্রিল মাসে প্যারিসে এই পাণ্ডুলিপির অংশবিশেষ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হল। প্রথম পূর্ণাঙ্গ ইংরেজি সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৩৮ সালে লণ্ডনে। পাঁচ মাসের মধ্যে চারবার পুনর্মুদ্রিত হয়ে বইটি সারা পৃথিবীতে এই বার্তা প্রচার করেছিল যে নাৎসী জার্মানির অভ্যন্তরে অন্য এক জার্মানিও আছে।

তবে খাস জার্মানিতে এই বইটির প্রকাশ ইতিহাসের পট-পরিবর্তনের মুখাপেক্ষী ছিল। যে পট-পরিবর্তনের সূচনা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে এবং পরিণতি জার্মান গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠায়। এইভাবে বইটির প্রথম প্রকাশের প্রায় দুই যুগ পরে জার্মানিতে বইটি আত্মপ্রকাশ করতে পারে এবং বইয়ের লেখক নানা সম্মানে সম্মানিত হন। তবে, যে-ভবিষ্যতের জন্যে এককালের শহীদরা জীবনদান করেছিলেন সেই ভবিষ্যতের বাস্তব রূপায়ণের মধ্যে দাঁড়িয়ে সেই কালটির ইতিবৃত্ত যখন পাওয়া গেল তখনো কিন্তু দেখা যাচ্ছে জার্মানির পশ্চিমাংশে আবার সেই একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি। খুব সম্ভবত সেখানে আবার সেই এককালের শহীদদের মতোই নতুন করে জীবনদানের প্রস্তুতি চাই। এবং বর্তমান যেখানে অতীত, সেখানে ভবিষ্যতের পথ করতে হলে এমনি ধরনের বই নিঃসন্দেহে জোরালো হাতিয়ার। অন্যান্য দেশেও কখনো কখনো অতীতকে বর্তমান করে তোলার প্রচেষ্টা অসম্ভব নয়। সেক্ষেত্রেও এই খণ্ডকালের অভিজ্ঞতা প্রতিরোধ গড়ে তুলতে প্রেরণা দেবে।

Our Street : Jan Peterson. Seven Seas Books, Berlin. Distributor : National Book Agency Pr. Ltd., Calcutta. Rs. 2-50.

রবীন্দ্রনাথ ও জাতীয়তাবাদ

নেপাল মজুমদার

'জাতীয়তাবাদ' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের পরিণত চিন্তাধারার উপর আজকাল প্রচুর আলোচনা, বিস্তর তর্কবিতর্ক হয়েছে। এ সম্পর্কে নতুন করে কিছু বলার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। কিন্তু জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা-ভাবনার উৎসটি কোথায় এবং তার ঐতিহাসিক ক্রম-পরিণতির ধারাটিই বা কী এ সম্পর্কে কিছু আলোচনা হওয়ার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয়। অর্থাৎ জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ধ্যান-ধারণা বা চিন্তাধারার আলোচনা করতে গেলে তাকে ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করাটাই যুক্তিযুক্ত হবে।

আমাদের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সূচনাকাল থেকেই রবীন্দ্রনাথ জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করে এসেছেন। জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে তিনি যে লেখনী ধারণ করে বা ভাষণ দিয়েই ক্ষান্ত ছিলেন তা নয় ; পরন্তু আমাদের জাতীয় আন্দোলনে ও স্বাধীনতা সংগ্রামে উগ্র ও সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে সারা জীবন তিনি ক্ষমাহীন কঠোর সংগ্রাম চালিয়ে এসেছেন এবং তার সঠিক মূল্যায়ণ করে তার বিশ্বমানবতা ও আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিত রাখবার চেষ্টা করেছেন। আর তাছাড়া আরো একটা বড় কথা, তিনি যে জাতীয় আন্দোলন থেকে দূরে সরে থেকে একটা নিরাসক্ত ও নির্লিপ্ত দৃষ্টিভঙ্গিতে জাতীয়তাবাদের আদর্শের সমালোচনা করেছিলেন, তা নয়। অবশ্য একথাও সত্য আজকাল আমরা যাকে "রাজনীতি করা" বলি, রবীন্দ্রনাথ তেমন কিছু রাজনীতি করেন নি। কিন্তু আমাদের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের সমগ্র ইতিহাস জুড়ে তিনি একটি বিশিষ্ট সক্রিয় ভূমিকা নিয়ে বিরাজ করছেন।

জাতীয় কংগ্রেসের তখনো জন্ম হয়নি। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ, আনন্দ-মোহন বসু, রাজনারায়ণ বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি কয়েকজনে মিলে এদেশে জাতীয়তাবাদী রাজনীতির প্রবর্তন করেন। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে 'ইলবার্ট

বিল' আন্দোলনের সময়ই 'জাতীয়তাবাদী রাজনীতি' কিছুটা স্পষ্ট রূপ নেয়। ঐ বৎসরই সুরেন্দ্রনাথ, আনন্দমোহন প্রভৃতি কয়েকজনের চেষ্টায় 'ন্যাশনাল কনফারেন্স' আহূত হয়। সেই সময় দেশের ইংরেজী শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে 'নেশন' 'ন্যাশন্যালিজম' 'ন্যাশনাল ফণ্ড' 'ন্যাশনাল থিয়েটার' 'ন্যাশনাল পেপার'—এসব শব্দ নিয়ে জোর উত্তেজনাপূর্ণ আলোচনা চলতে থাকে।

অত্যন্ত আশ্চর্যের ও বিস্ময়ের কথা, রবীন্দ্রনাথ শুরু থেকেই এই নব জাতীয়-উন্মাদনাকে একেবারেই সমর্থন করলেন না। এই সময় 'ভারতী' পত্রিকায় 'চেঁচিয়ে বলা', 'ন্যাশনল ফণ্ড', 'জিহ্বা-আস্ফালন', 'হাতে কলমে'—প্রভৃতি প্রবন্ধে ঐসব শূন্যগর্ভ জাতীয়তাবাদী আবেগ-উচ্ছ্বাসকে অত্যন্ত তীব্র ও কঠোর ভাষায় ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করলেন। 'নেশন', 'ন্যাশনালিজম'—এসব কথা বলতে গিয়ে নেতৃবৃন্দের ভাবাবেগে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসত। অথচ তাতে দেশের লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষের দুঃখ কষ্টের কথা এক বর্ণও থাকত না। দেশীয় 'সিবিলিয়নদের' দাবি-দাওয়া আর চাকরি-বাকরির দাবি-দাওয়া ছাড়া এই সব ন্যাশনালিষ্ট বুদ্ধিজীবীরা যেন আর কিছুই ভাবতেও পারতেন না।

রবীন্দ্রনাথ তখনই এই 'ন্যাশনাল-উন্মাদনা'য় কোথায় যেন এক মস্ত ফাঁকিবাজী আছে বলে আবিষ্কার করলেন। তিনি পরিষ্কার লক্ষ্য করলেন. বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর সঙ্কীর্ণ শ্রেণী স্বার্থটাই তৎকালীন জাতীয় নেতৃবৃন্দের অ্যাজিটেশন আন্দোলনগুলিতে অত্যন্ত প্রকট হয়ে উঠেছে।

ঐ সময় 'ন্যাশনাল ফণ্ড' (ভারতী ১২৯০ কার্তিক) প্রবন্ধে তিনি লিখলেন,

> "ন্যাশনল শব্দটার ব্যবহার অত্যন্ত প্রচলিত হইয়াছে। ন্যাশনল থিয়েটার, ন্যাশনল মেলা, ন্যাশনল পেপর ইত্যাদি……। একমাত্র Political agitation-ই এই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য।
>
> "…আমাদের দেশে political agitation করার নাম ভিক্ষাবৃত্তি করা। ভিক্ষুক মানুষেরও মঙ্গল নাই, ভিক্ষুক জাতিরও মঙ্গল নাই। …গবর্মেন্টকে চেতন করাইতে তাঁহারা যে পরিশ্রম করিতেছেন, নিজের দেশের লোককে চেতন করাইতে সেই পরিশ্রম করিলে যে বিস্তর শুভফল হইত।"

সেই সময় থেকেই তিনি জাতির আত্মশক্তি অর্জনের উপর জোর দিতে শুরু করেন। আত্মশক্তি বলতে তিনি জনশক্তি ও জনচেতনা জাগ্রত করবার কথাই বললেন। তিনি বললেন, "বঙ্গবিদ্যালয়ে দেশ ছাইয়া সেই সমুদয় শিক্ষা

বাংলায় ব্যাপ্ত হইয়া পড়ুক। ইংরেজিতে শিক্ষা কখনই দেশের সর্বত্র ছড়াইতে পারিবে না।" তিনি বললেন, ইংরেজ সাহেবদের অত্যাচার নির্যাতনের প্রতিরোধ করে দেশের লোককে রক্ষা করো। আর তা হলে জাতির আত্মবিশ্বাস ফিরে আসবে এবং আত্মশক্তি অর্জন করবে।

একথা একশোবার সত্য, আমাদের মতো পরাধীন ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ই জাতীয়তাবাদী ভাবধারায় দেশের মানুষকে স্বাধীনতা সংগ্রামে সংগঠিত করেছিলেন। এইদিক থেকে এর ঐতিহাসিক তাৎপর্য অসীম। কিন্তু জাতীয়স্বার্থ বলতে তৎকালীন নেতৃবৃন্দ শুধু বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর সংকীর্ণ শ্রেণীস্বার্থই বুঝতেন। দ্বিতীয়ত আমাদের জাতীয়স্বার্থ ও বৃটিশ-এম্পায়ারের স্বার্থ সমঅর্থ সূচক বলেই তাঁরা মনে করতেন। ইংরেজ সাম্রাজ্যের সঙ্গে বন্ধন ছিন্ন করা তো দূরের কথা বৃটিশ এম্পায়ারেরই পক্ষপুটের আড়ালে এঁরা আরো পরিপুষ্ট হতে চেয়েছেন। সেই কথাটাই সভা-সমিতিতে জোর গলায় তাঁরা ঘোষণা করতেন। এই দাস মনোবৃত্তিকে—এই ভিক্ষাবৃত্তিকে রবীন্দ্রনাথ কঠোর ভাষায় বিদ্রূপ ও সমালোচনা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ প্রথমদিকে কংগ্রেসের সভা সম্মেলনগুলিতে যোগদান করেছিলেন, জাতীয়-সংহতি ও ঐক্যের জন্য সারা ভারতবর্ষব্যাপী কংগ্রেসের মতো একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা সমর্থন করেছিলেন এবং গণতান্ত্রিক শাসন সংস্কার-মূলক কংগ্রেসের দাবিদাওয়াগুলি সমর্থন করেছিলেন—তা সত্য কিন্তু কংগ্রেসের নির্লজ্জ ইংরেজস্তুতি ও ভিক্ষাবৃত্তিকে তিনি সমর্থন তো করতেই পারলেন না পরন্তু কঠোর ভাষায় তিনি তাকে বিদ্রূপ ও তিরস্কার করলেন। আর সবথেকে উল্লেখযোগ্য—আদর্শের ক্ষেত্রে তিনি 'জাতীয়তাবাদী' আদর্শকে গ্রহণই করতে পারলেন না।

রবীন্দ্রনাথ এক বিস্ময়কর ব্যতিক্রম। উনবিংশ থেকে বিংশ শতাব্দীর উত্তরণকালে ভাবাদর্শের ক্ষেত্রে তিনি সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ অবস্থায় বিচরণ করেছেন। দেশের তো নয়ই—বিদেশেরও খুব কম মনীষীই তাঁর নাগাল পেয়েছেন বা পাশাপাশি সেদিন তাঁর সঙ্গে চলতে পেরেছেন। কিন্তু কবির সেই রাজনৈতিক ধারণার মূল বৈশিষ্ট্য কি ?

পূর্বেই উল্লেখ করেছি—দেশের তৎকালীন কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে ইংলণ্ডের পার্লামেন্টারী রাজনীতি অভিভূত করেছিল। তাঁরা দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনকে সেই আদর্শেই ছক কেটে চালনা করতে চেয়েছিলেন। এটা

তাঁদের এতখানি অভিভূত করেছিল যে ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদী শোষণ-নীতিকে তাঁরা কোথাও দেখতে পেলেন না। পরন্তু বৃটিশ সাম্রাজ্যকে তাঁরা বহু ভাগ্যবলেই পেয়েছেন এবং এশিয়ার পরিত্রাতা ও মুক্তিদাতা হিসাবেই তাঁরা যেন ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছেন বলে প্রচার করলেন।

পক্ষান্তরে, রবীন্দ্রনাথ অতি অল্প বয়স থেকেই ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদী শোষণনীতিকে পরিষ্কার দেখতে পেয়েছিলেন। 'চীনে মরণের ব্যবসায়', 'ইংরেজ ও ভারতবাসী', 'ইংরেজের আতঙ্ক', 'রাজনীতির দ্বিধা' প্রভৃতি প্রবন্ধে ইওরোপের বিশেষ করে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী সভ্যতার তীব্র সমালোচনা ও নিন্দাবাদ করলেন। এর ফলে রাজনীতি বিশেষ করে ইওরোপের জাতীয়তাবাদী রাজনীতির উপর তাঁর তীব্র সন্দেহ ও বীতরাগ জন্মাতে শুরু করে। এর অনতিকাল পরে 'বুয়র যুদ্ধ' ও চীনের 'বক্সার বিদ্রোহের' সময় ইওরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির কুৎসিত ও বীভৎস নগ্নরূপটা আরো পরিষ্কার দেখতে পেলেন। তিনি পরিষ্কার দেখতে পেলেন, রাজনীতিতে আমরা যে জাতীয়তাবাদের পূজা করতে বসেছিলাম, ইওরোপীয় দেশগুলিতে তার পরিণতি কোথায় ও কোনদিকে চলেছে। এশিয়া ও আফ্রিকার উপনিবেশ ও বাজার লুটপাট করবার জন্য সে দেশের গোটা 'দেশকে-দেশ' এই জাতীয়তাবাদের মদ খেয়ে মাতাল হয়ে হিংস্র শ্বাপদের মতো আপনাদের মধ্যে কামড়া-কামড়ি করছে। বর্তমান শতাব্দী আরম্ভ হলো এমনি করেই। বেদনাহত ক্রুদ্ধ কবি, এই সময়ই 'নৈবেদ্য'র একটি কবিতায় লিখলেন :

"শতাব্দীর সূর্য্য আজি রক্ত মেঘ-মাঝে
অস্ত গেল, হিংসার উৎসবে আজি বাজে
অস্ত্রে অস্ত্রে মরণের উন্মাদ রাগিনী
ভয়ংকরী
—প্রলয়মন্থন ক্ষোভে
ভদ্রবেশী বর্বরতা উঠিয়াছে জাগি
পঙ্ক শয্যা হতে। লজ্জা শরম তেয়াগি
জাতি প্রেম নাম ধরি প্রচণ্ড অন্যায়
ধর্মেরে ভাসাতে চাহে বলের বন্যায়।
কবিদল চীৎকারিছে জাগাইয়া ভীতি
শ্মশান-কুক্কুরদের কাড়াকাড়ি গীতি।"

আর একটি কবিতায় লিখলেন :

"একের স্পর্দ্ধা কভু নাহি দেয় স্থান
দীর্ঘকাল নিখিলের বিরাট বিধান।
স্বার্থ যত পূর্ণ হয় লোভ ক্ষুধানল
তত তার বেড়ে ওঠে, বিশ্ব ধরাতল
আপনার খাদ্য বলি না করি বিচার
জঠরে পুরিতে চায়। বীভৎস আহার
বীভৎস ক্ষুধারে করে নির্দয় নিলাজ—
... ...
ছুটিয়াছে জাতিপ্রেম মৃত্যুর সন্ধানে
বাহি স্বার্থতরী, গুপ্ত পর্বতের পানে।"

ইওরোপীয় দেশগুলির জাতীয়তাবাদী সভ্যতাকে এমন কঠোর ভাষায় বিদ্রূপ ও সমালোচনা করতে এদেশের কোনো রাজনীতিবিদ বা কবি-সাহিত্যিককে তো নয়ই—সমকালীন পৃথিবীর কোনো দেশের কোনো কবিকেই দেখা গিয়েছিল কিনা তাতে খুবই সন্দেহ আছে। স্মরণ রাখা দরকার বার্নার্ড শ-এর মতো বিবেকী চিন্তাবিদও খুব দ্ব্যর্থহীনভাবে বুয়রদের পক্ষে কথা বলতে পারলেন না। আফ্রিকায় ইংরেজের সোনার খনির লোভকে তিনি সমালোচনা করলেও পরিষ্কার দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদকে ভর্ৎসনা করলেন না। গান্ধীজী যে তখন দক্ষিণ আফ্রিকায় ইংরেজদের পক্ষ গ্রহণ করে তাতে অংশ গ্রহণ করেছিলেন, সে ইতিহাসও স্মরণ রাখা দরকার।

ইওরোপের সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিতে উগ্র-জাতীয়তাবাদ কী আকারে ও কীভাবে অভিব্যক্তি পাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথ তখন তা গভীর ভাবে লক্ষ্য করছিলেন। এই সময় 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা' নামে একটি প্রবন্ধে (১৩০৮ ; ১৯০১ বঙ্গদর্শন) তিনি লিখলেন :

"ইংলণ্ড বল, ফ্রান্স বল, আর সকল বিষয়েই জনসাধারণের মধ্যে মতবিশ্বাসের প্রভেদ থাকিতে পারে, কিন্তু স্ব স্ব রাষ্ট্রীয় স্বার্থ প্রাণপণে রক্ষা ও পোষণ করিতে হইবে, এ সম্বন্ধে মতভেদ নাই। সেইখানেই তাহারা একাগ্র, তাহারা প্রবল, তাহারা নিষ্ঠুর, সেইখানে আঘাত লাগিলেই সমস্ত দেশ এক মূর্তি ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান হয়।..."

কিন্তু ইওরোপীয় দেশগুলির এই রাষ্ট্রীয় স্বার্থের প্রকৃতিটি কী? তার উত্তরে রবীন্দ্রনাথ বললেন :

"প্রত্যেক জাতির যেমন একটি জাতিধর্ম আছে, তেমনি জাতিধর্মের অতীত একটি শ্রেষ্ঠ ধর্ম আছে, তাহা মানবসাধারণের।

"য়ুরোপীয় সভ্যতার মূল রাষ্ট্রীয় স্বার্থ যদি এত অধিক স্ফীতিলাভ করে যে ধর্মের সীমাকে অতিক্রম করিতে থাকে, তবে বিনাশের ছিদ্র দেখা দিবে এবং সেই পথে শনি প্রবেশ করিবে।

"স্বার্থের প্রকৃতিই বিরোধ। য়ুরোপীয় সভ্যতার সীমায় সীমায় সেই বিরোধ উত্তরোত্তর কণ্টকিত হইয়া উঠিতেছে। পৃথিবী লইয়া ঠেলাঠেলি কাড়াকাড়ি পড়িবে তাহার পূর্বসূচনা দেখা যাইতেছে।

"ইহাও দেখিতেছি, য়ুরোপের এই রাষ্ট্রীয় স্বার্থপরতা ধর্মকে প্রকাশ্যভাবে অবজ্ঞা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। 'জোর যার মুলুক তার' এ-নীতি স্বীকার করিতে আর লজ্জা বোধ করিতেছে না।···

"রাষ্ট্রতন্ত্রে মিথ্যাচারণ, সত্যভঙ্গ, প্রবঞ্চনা এখন আর লজ্জাজনক বলিয়া গণ্য হয় না। যে-সকল জাতি মনুষ্যে মনুষ্যে ব্যবহারে সত্যের মর্যাদা রাখে, ন্যায়চরণকে শ্রেয়োজ্ঞান করে, রাষ্ট্রতন্ত্রে তাহাদেরও ধর্মবোধ অসাড় হইয়া থাকে। সেইজন্য ফরাসী, ইংরেজ, জার্মান, রুশ ইহারা পরস্পরকে কপট ভণ্ড, প্রবঞ্চক বলিয়া উচ্চস্বরে গালি দিতেছে।

"ইহা হইতে এই প্রমাণ হয় যে রাষ্ট্রীয় স্বার্থকে য়ুরোপীয় সভ্যতা এতই আত্যন্তিক প্রাধান্য দিতেছে যে, সে ক্রমশই স্পর্দ্ধিত হইয়া ধ্রুবধর্মের উপর হস্তক্ষেপ করিতে উদ্যত হইয়াছে। এখন গত শতাব্দীর সাম্য-সৌভ্রাত্রের মন্ত্র য়ুরোপের মুখে পরিহাস বাক্য হইয়া উঠিয়াছে।"

বুঝতে কষ্ট হয় না, ইওরোপের জাতীয়তাবাদী রাজনীতির উপর কবির সন্দেহ ও বীতরাগটা কোথায় ও কেন। ইওরোপের জাতীয়তাবাদ যে 'National State'-এর মাধ্যমেই অভিব্যক্তি পাচ্ছে এবং এই National State'-এর আসল লক্ষ্য ও ঝোঁকটা হচ্ছে পরদেশ লুণ্ঠন ও পরজাতি বিদ্বেষ—তাও রবীন্দ্রনাথ পরিষ্কার দেখতে পেলেন।

কিন্তু তিনি মূল প্রশ্নের চাবিকাঠিটি 'ছুঁই-ছুঁই' করেও ছুঁতে পারলেন না। রবীন্দ্রনাথের ধারণা, পাশ্চাত্য দেশের 'নেশন' ও ন্যাশনাল-স্টেট ভিত্তিক সভ্যতাই হলো যত নষ্টের, যত সর্বনাশের কারণ। কখনও বা তিনি তাকে

রিপুর প্রবল তাড়না বলে অভিহিত করলেন। কিন্তু এই সত্য তিনি দেখতে পেলেন না যে, ইওরোপের নেশন ও রাষ্ট্রগুলি সেখানকার পুঁজিবাদী-উৎপাদন ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে। পুঁজিবাদের বিকাশ ও ঐতিহাসিক স্বার্থের প্রয়োজনে নেশন ও ন্যাশনল-স্টেট গড়ে উঠেছে। পুঁজিবাদের অন্তর্নিহিত কারণের মধ্যেই রয়েছে তার সাম্রাজ্যলালসা। কবির ভাষায়—লোভ, কামনা ও রিপুর প্রবল তাড়না যা অনায়াসেই মানবতা, ধর্মাধর্মবোধ ও ন্যায়নীতিকে পদদলিত করে চলেছে।

স্মরণ রাখা দরকার তখনও আমাদের দেশে বিজ্ঞানসম্মত অর্থনৈতিক রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রচলন হয় নি। স্বভাবতই তাঁর চিন্তা ও দৃষ্টি অতীতের দিকে ঝুঁকে পড়ে। তাঁর ধারণা হলো, ভারতের প্রাচীন সমাজ-সভ্যতার বৈশিষ্ট্যটুকু আত্মস্থ করে জাতিনির্মাণের কাজে লাগতে হবে।

অবশ্য তার অর্থ এই নয় যে, রবীন্দ্রনাথ তৎকালীন রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে একেবারে দূরে সরে থাকলেন। তৎকালীন দেশের গণতান্ত্রিক শাসনসংস্কারের পক্ষে তিনিই অত্যন্ত জোরালো ও তেজস্বিনী ভাষায় লিখতে লাগলেন। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে তিলক ও নাটু ভ্রাতৃদ্বয়ের গ্রেপ্তারের পর 'সিডিশন বিল'-এর প্রতিরোধ আন্দোলনে তিনি যে জাতির পুরোভাগে এসে দণ্ডায়মান হয়েছিলেন সে কথাও ভুলে যাবার নয়। ভারতবর্ষের এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান শাসকসম্প্রদায়ের অত্যাচার ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে তিনি যত তীব্র উত্তেজনাকর ভাষায় প্রতিবাদ ও সমালোচনা করেছিলেন এমনটি আর দেশের কাউকেই দেখা যায় নি সেদিন। বরঞ্চ আশ্চর্যের কথা—কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ তখনও বৃটিশ-এম্পায়ার ও ইংরাজজাতির ন্যায়পরতা ও মহানুভবতার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে বক্তৃতা করতেন। রবীন্দ্রনাথ কঠোর ভাষায় ইওরোপের সাম্রাজ্যলালসা ও জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে সমালোচনা করছিলেন বটে কিন্তু সব থেকে আশ্চর্যের ব্যাপার, তিনিই সর্বপ্রথম একটি বলিষ্ঠ জাতীয় চেতনা ও স্বাদেশিকতাবোধ জাগ্রত করবার জন্য দেশে আন্দোলন গড়তে চেষ্টা করছিলেন। মাতৃভাষায় শিক্ষার সর্বাঙ্গীন বিকাশ ও প্রসারের জন্য তিনিই সর্বপ্রথম তীব্র আন্দোলন চালাতে লাগলেন। আমাদের জাতীয় নেতৃবৃন্দ তখনও পর্যন্ত সাহেবী পোশাকে সাহেবী ঢঙে ইংরেজীতে বক্তৃতা করতেন। ১৮৯৭ সালে নাটোরে প্রাদেশিক কনফারেন্সে রবীন্দ্রনাথই কংগ্রেসের সভা-সম্মেলনগুলিতে ইংরেজী ভাষার পরিবর্তে বাংলা ভাষায়

বক্তৃতা ও সম্মেলনের কাজ চালু করবার জন্যে এক তুমুল হট্টগোল ও আন্দোলন তুলেছিলেন, সে কথাও ভুলে যাবার নয়। কোট পেন্টুলাম পরা কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দকে লক্ষ্য করে ঐ সময়ই তিনি 'পরবেশ' কবিতায় লিখলেন :

"কে তুমি ফিরিছ পরি প্রভুদের সাজ
ছদ্মবেশে বাড়ে না কি চতুর্গুণ লাজ।
পরবস্ত্র অঙ্গে তব হয়ে অধিষ্ঠান
তোমারেই করিছে না নিত্য অপমান ?
সর্বাঙ্গে লাঞ্ছনা বহি এ কী অহংকার
ওর কাছে জীর্ণ চীর জেনো অলংকার।"

ঐ সময় 'ভিক্ষায়াং নৈব নৈবচ' নামে অপর একটি কবিতায় বললেন :

"তোমার যা দৈন্য মাতঃ তাই ভূষা মোর
কেন তাহা ভুলি !
পরধনে ধিক গর্ব ? করি করজোড়,
ভরি ভিক্ষা ঝুলি ?
পুণ্য হস্তে শাক-অন্ন তুলে দাও পাতে,
তাই যেন রুচে ;
মোটা বস্ত্র বুনে দাও যদি নিজ হাতে
তাহে লজ্জা ঘুচে।"

এমনি তীব্র ছিল স্বাজাত্যবোধ ও স্বদেশপ্রীতি। এক কথায় তিনি আমাদের চিন্তায় ভাবনায় পোশাকে-আশাকে ভাবে-ভাষায় একটি সর্বাঙ্গীন সুষ্ঠু স্বদেশী কৃষ্টি গড়ে তুলবার জন্য আন্দোলন চালিয়েছিলেন।

কিন্তু ইওরোপের জাতীয়তাবাদী-রাজনীতির আদর্শকে তিনি গ্রহণ করতে পারলেন না। (১৩০৮ বা ১৯০১ বঙ্গদর্শন-এ) 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য', 'নেশন কী', 'হিন্দুত্ব', 'ব্রাহ্মণ', 'বিরোধমূলক আদর্শ' প্রভৃতি প্রবন্ধে নেশন ও ন্যাশনালিজম-আদর্শের বিস্তারিত সমালোচনা করলেন। 'বিরোধমূলক আদর্শ' প্রবন্ধে ইওরোপের 'ন্যাশনালিজম', 'প্যাট্রিয়টিজম' আদর্শের যে বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করলেন তা অত্যন্ত প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখলেন :

..."মিথ্যার দ্বারাই হউক ভ্রমের দ্বারাই হউক, নিজেদের কাছে নিজেকে বড়ো করিয়া প্রমাণ করিতেই হইবে এবং সেই উপলক্ষে

অন্য নেশনকে ক্ষুদ্র করিতেই হইবে, ইহা নেশনের ধর্ম, ইহা প্যাট্রিয়টিজমের প্রধান অবলম্বন। গায়ের জোর, ঠেলাঠেলি, অন্যায় ও সর্বপ্রকার মিথ্যাচারের হাত হইতে নেশনতন্ত্রকে উপরে তুলিতে পারে, এমন সভ্যতার নিদর্শন তো আমরা এখনো য়ুরোপে পাই না।"

..."স্বার্থের বিরোধ অবশ্যম্ভাবী এবং স্বার্থের সংঘাতে মানুষকে অন্ধ করিবেই। ইংরেজ যদি সুদূর এশিয়ায় কোনো প্রকার সুযোগ ঘটাইতে পারে ফ্রান্স তখনই সচকিত হইয়া ভাবিতে থাকিবে, ইংরেজের বলবৃদ্ধি হইতেছে।...এক নেশনের প্রবলত্ব অন্য নেশনের পক্ষে সর্বদাই আশঙ্কাজনক। এ স্থলে বিরোধ বিদ্বেষ অন্ধতা মিথ্যাপবাদ, সত্যগোপন—এ সমস্ত না ঘটিয়া থাকিতে পারে না।"

এই বলে তিনি দেশকে তখনই সতর্ক করে দিয়ে বললেন :

"আমরা যদি বাঁধি বোলে না-ভুলি, যদি প্যাট্রিয়টকেই সর্বোচ্চ বলিয়া মনে না করি, যদি সত্যকে ন্যায়কে ধর্মকে ন্যাশনলত্বের অপেক্ষাও বড়ো বলিয়া জানি, তবে আমাদের ভাবিবার বিষয় বিস্তর আছে।... ধর্মের দিকে না তাকাইলেও সুবুদ্ধির হিসাব হইতে এ কথা পর্যালোচনা করিতে হইবে যে, ন্যাশনাল স্বার্থের আদর্শকে খাড়া করিলেই বিরোধের আদর্শকে খাড়া করা হয়—সেই আদর্শ লইয়া আমরা কি কোনো কালে য়ুরোপের মহাকায় দানবের সহিত লড়াই করিতে পারিব ?"

সত্য কথা এইকালে এই সব প্রবন্ধগুলিতে রবীন্দ্রনাথ এক 'হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদের' আন্দোলন তুলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সেটা হিন্দুয়ানার জন্য হিন্দুয়ানা নয়। তিনি মানবতা, সমাজবোধ ও ন্যায়নীতির এক মহান্ আদর্শের জন্য উপর ভিত্তি করে হিন্দু জাতীয়তাবাদী ঐক্য গড়ে তুলতে চাইলেন। অর্থাৎ সেদিন তাঁর হিন্দুয়ানার মধ্যে মানবতা, সমাজবোধ, সমষ্টিচেতনা, সুবিচার ও ন্যায়নীতিটাই প্রবল ও মুখ্য হয়ে উঠেছিল এবং হিন্দুয়ানাটা হয়েছিল গৌণ।

কিন্তু ইওরোপের সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির জাতীয়তাবাদী সভ্যতার স্বরূপটা চিনতে তাঁর ভুল হয়নি। স্মরণ রাখা দরকার রমাঁ রলাঁ কিংবা আঁরি বারবুসের মতো শিল্পীরাও তখনও ইওরোপের সাম্রাজ্যবাদী ও জাতীয়তাবাদী সভ্যতার বিরুদ্ধে যোদ্ধার বেশে অবতীর্ণ হননি। এমনকি লেনিনও তখনও "Self determination of Nations"-এর উপর তাঁর বিখ্যাত

ঐতিহাসিক নিবন্ধ রচনা করেন নি। ১৯১৪ সালে লেনিনের ঐ নিবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল।

এর অনতিকাল পরেই ১৯০৪-৫ সালে কার্জনের 'য়ুনিভার্সিটি বিল' ও 'বঙ্গভঙ্গ বিল'-এর বিরুদ্ধে সমগ্র বাংলাদেশে যে উত্তাল গণবিক্ষোভ ও স্বদেশী আন্দোলনের জোয়ার এসেছিল রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং তার পুরোভাগে এসে দণ্ডায়মান হয়েছিলেন—সে ইতিহাসও আজ প্রায় সকলেই জানেন।

সে এক তীব্র জাতীয়তাবাদ ও স্বাদেশিকতার যুগ। এই কালেই স্বদেশী-সমাজ, স্বদেশী শিক্ষা, স্বদেশী সংগীত, স্বদেশী আর্ট, স্বদেশী নাটক সৃষ্টি এবং স্বদেশী বস্ত্র ও স্বদেশী পণ্য ব্যবহারের জন্য তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়েছিল। এই আন্দোলনের সময়ই রবীন্দ্রনাথ 'বাংলার মাটি বাংলার জল', 'ও আমার দেশের মাটি', 'সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে' প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ দেশাত্ম-বোধক গানগুলি রচনা করেন।

কিন্তু সব থেকে বিস্ময়কর ও উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হলো যে, রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং একদিকে দেশের স্বাজাত্যবোধ ও স্বাদেশিকতাবোধকে জাগরিত করবার জন্য সর্ববিষয়ে অগ্রণী হলেন, অপরদিকে সেই সময় তিনিই পাশ্চাত্ত্য দেশের 'উগ্র-ন্যাশনালিজম' ও 'প্যাট্রিয়টিজম' সম্পর্কে তীব্র সমালোচনা করে দেশকে সে বিষয়ে সতর্ক করে দিতে চাইলেন। এই সময়ই তিনি তাঁর বিখ্যাত 'ইম্পীরিয়লিজম' ও 'দেশের কথা' প্রবন্ধটি রচনা করেছিলেন। 'দেশের কথা' (বঙ্গদর্শন—১৩১১) প্রবন্ধে লিখলেন :

> …"প্যাট্রিয়টিজমের প্রতিশব্দ দেশহিতৈষিতা নহে। জিনিসটা বিদেশী, নামটাও বিদেশী থাকিতে দোষ নাই। যদি কোনো বাংলা শব্দ চালাইতে হয়, তবে স্বাদেশিকতা কথাটা ব্যবহার করা যাইতে পারে।"

> "স্বাদেশিকতার ভাবখানা এই যে, স্বদেশের উর্দ্ধে আর কিছুকে স্বীকার না-করা। স্বদেশের লেশমাত্র স্বার্থ যেখানে বাধে না সেইখানেই ধর্ম বল, দয়া বল, আপনার দাবি উত্থাপন করিতে পারে—কিন্তু যেখানে স্বদেশের স্বার্থ লইয়া কথা সেখানে সত্য, দয়া, মঙ্গল সমস্ত নীচে তলাইয়া যায়। স্বদেশীয় স্বার্থপরতাকে ধর্মের স্থান দিলে যে ব্যাপারটা হয় তাহাই প্যাট্রিয়টিজম শব্দের পদবাচ্য।"

একটা দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে তিনি বললেন :

> "ইংরেজ কখনোই একথা ভাবে না যে, পৃথিবীতে ফরাসী সভ্যতার একটা উপকারিতা আছে, অতএব সে সভ্যতায় আঘাত করিলে সমস্ত মানবের সুতরাং আমাদেরও ক্ষতি। নিজের পেট ভরাইবার জন্য আবশ্যক হইলে ফরাসীকে সে বটিকার মত গিলিয়া ফেলিতে পারে।…এ'স্থলে ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য এশিয়া-আফ্রিকার ডালপালা সমস্ত মুড়াইয়া খাইলে কোনো দোষ দেখি না।"

এই হচ্ছে ইওরোপের 'ন্যাশনালিজম' ও 'প্যাট্রিয়টিজম'-এর প্রকৃত চেহারা। তাই তিনি স্বদেশী-উন্মত্ত দেশকে সতর্ক করে দিয়ে বললেন :

> …"এই সময়েই আমাদের মোহমুক্ত হওয়া দরকার। অনিবার্য্য প্রয়োজনে যাহা আমাকে লইতেই হইবে, তাহার সম্বন্ধে অতিমাত্রায় মুগ্ধভাব থাকা কিছু নয়। একথা যেন মনে না করি, জাতীয় স্বার্থ-তন্ত্রই মনুষ্যত্বের চরম লাভ। তাহার উপরেও ধর্মকে রক্ষা করিতে হইবে—মনুষ্যত্বকে ন্যাশনলত্বের চেয়ে বড়ো বলিয়া জানিতে হইবে। ন্যাশনলত্বের সুবিধার খাতিরে মনুষ্যত্বকে পদে পদে বিকাইয়া দেওয়া, মিথ্যাকে আশ্রয় করা, ছলনাকে আশ্রয় করা, নির্দয়তা আশ্রয় করা প্রকৃতপক্ষে ঠকা। সেইরূপ ঠকিতে ঠকিতে অবশেষে একদিন দেখা যাইবে ন্যাশনলত্ব শুষ্ক দেউলে হইবার উপক্রম হইয়াছে।"

লক্ষ্য করবার বিষয়, তখনও তিনি 'ধর্ম ও মনুষ্যত্ব'কে ন্যাশনলত্বের চেয়েও শ্রেষ্ঠ ও বড় করে দেখবার আহ্বান জানাচ্ছেন। রবীন্দ্রনাথের দেশাত্মবোধ বা স্বদেশপ্রেমের মধ্যে স্বদেশ ও স্বজাতি শ্রেষ্ঠত্ববোধের লেশমাত্রও স্থান নেই। একটা দৃষ্টান্ত দিলে জিনিসটা একটু পরিষ্কার হবে। রবীন্দ্রনাথের 'ও আমার দেশের মাটি' 'সার্থক জনম আমার', আর ডি. এল. রায়ের 'ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা' গানটি কিছু আগে-পরে হলেও প্রায় একই সময়ে লেখা। তবু এই গানগুলির মধ্যে কী পার্থক্য! "এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি সকল দেশের রানী সে যে আমার জন্মভূমি"—একথা রবীন্দ্রনাথ কোনোদিনই বলতে পারলেন না। এর মধ্যে যে 'chauvinism'-এর কিছুটা গন্ধ আছে, সে-কথা অস্বীকার করে লাভ নেই—আর এই chauvinism রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে, গানে কোথাও দেখা যায় না, সে যুগে আমাদের দেশে তার ঐতিহাসিক তাৎপর্য যতই থাক না কেন।

অর্থাৎ তিনি বলতে চাইলেন আমাদের জাতীয় স্বার্থের অথবা রাজনীতির প্রয়োজনে আমরা যেন ধর্মবোধ ও মনুষ্যত্বকে গৌণ ও লাঞ্ছিত এবং অবমাননা না করি। এক কথায় এই স্বদেশী উন্মাদনার মাঝে অত্যন্ত বলিষ্ঠ কণ্ঠে ও সচেতনভাবে দেশের রাজনীতিকে এক সুমহান মানবতা ও ন্যায়নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছিলেন। বস্তুতপক্ষে গান্ধীজীর পূর্বেই ভারতের রাজনীতিতে রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম Means ও End-এর বিতর্কটি উত্থাপন করেন।

ঠিক এই কারণেই এর অনতিকাল পরেই (১৯০৮ সালে) বাংলার বিপ্লবাত্মক সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনকে কবি সমর্থন করতে পারলেন না। এই সময়ে 'পথ ও পাথেয়', 'সমস্যা', 'সদুপায়', 'দেশহিত' প্রভৃতি প্রবন্ধে এই মানবত্ব ও ন্যায়ধর্মের উপর তিনি বারবার গুরুত্ব আরোপ করলেন। 'পথ ও পাথেয়' প্রবন্ধে (বঙ্গদর্শন ১৩১৫ জ্যৈষ্ঠ) বললেন :

"প্রয়োজন অত্যন্ত গুরুতর হইলেও প্রশস্ত পথ দিয়াই তাহা মিটাইতে হয়—কোনো সংকীর্ণ রাস্তা ধরিয়া কাজ সংক্ষেপ করিতে গেলে একদিন দিক হারাইয়া শেষে পথও পাইব না, কাজও নষ্ট হইবে।"

'দেশহিত' প্রবন্ধে বললেন (১৩১৫ আশ্বিন) :

"ফল লক্ষ্য নহে, ধর্মই লক্ষ্য। ফললাভ চরম লাভ নহে। ধর্মলাভেই লাভ একথা যদি কেবল দেশহিতের বেলাতেই না খাটে তবে দেশহিত মানুষের যথার্থ হিত নহে।" কিন্তু কবির এই অভিযোগ শুধু দেশের সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধেই নয়—এ অভিযোগ প্রধানত এবং মূলত ইওরোপের সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতির বিরুদ্ধে—ইওরোপের উগ্র-জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে।

তাই এর কিছুকাল পরে ১৯১৪ সালে যখন মহাবিধ্বংসী প্রথম মহাযুদ্ধ বাধল তখন এদেশে একমাত্র রবীন্দ্রনাথই ইওরোপের ঐ যুদ্ধবাদী সভ্যতাকে তীব্র ও কঠোর ভাষায় নিন্দাবাদ ও ভর্ৎসনা করলেন। ঐ সময়েই 'লড়াইয়ের মূল' প্রবন্ধে (সবুজপত্র, ১৯১৪) সাম্রাজ্যবাদী মহাযুদ্ধের আসল মর্মকথাটি ফাঁস করে তুলে ধরলেন। এ যুদ্ধ যে পৃথিবীর বাজার ও উপনিবেশ নিয়ে প্রভুত্বের লড়াই এবং এশিয়া ও আফ্রিকায় ইওরোপের সেই প্রভুত্বের ক্ষেত্র—এ কথা রবীন্দ্রনাথই পরিষ্কার বিশ্লেষণ করে দেখালেন। স্মরণ রাখা দরকার, তখন গান্ধীজী থেকে শুরু করে জাতীয় নেতৃবৃন্দের প্রায় সকলেই মহাযুদ্ধে ইংরেজকে সমর্থন ও সহযোগিতা করেছিলেন। শুধু এদেশেই নয়—বার্ট্রাণ্ড রাসেল,

আইনস্টাইন ও রমাঁ রলাঁর ন্যায় দু-চার জন বিবেকী মানবপ্রেমিক ছাড়া সারা ইওরোপের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় বিবেকবুদ্ধি জলাঞ্জলি দিয়ে নিজ নিজ দেশের সরকারকে সমর্থন করে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করলেন। পিতৃভূমি, স্বদেশ ও স্বজাতির স্বার্থরক্ষার নামে সারা ইওরোপ এক ভ্রাতৃঘাতী মহাযুদ্ধের নিদারুণ বীভৎসতায় মেতে উঠল। যুধ্যমান দেশগুলির জাতিবৈরী ও পরজাতি বিদ্বেষ সারা পৃথিবীর পরিমণ্ডলকে বিষাক্ত করে তুলল।

রবীন্দ্রনাথ ইওরোপের জাতীয়তাবাদী রাজনীতির আসল রূপটা আরো স্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ করলেন।

১৯১৬ সাল। মহাযুদ্ধ তখন বীভৎসভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। এই সময়েই রবীন্দ্রনাথ জাপানে ও আমেরিকায় তাঁর অমর সৃষ্টি—যুদ্ধ ও জাতীয়তাবাদ বিরোধী বক্তৃতাগুলি সেখানে পাঠ করেন। এইগুলিই পরে 'Nationalism' গ্রন্থে সঙ্কলিত হয়েছে।

অবশ্য এই সব প্রবন্ধে তিনি যে খুব নূতন কথা কিছু বললেন তা নয়। বিংশ শতাব্দীর সূচনাকাল থেকেই এই বক্তৃতাগুলির সার কথা তিনি বিশ্লেষণ করেছিলেন পূর্বেই তা উল্লেখ করেছি। এই প্রবন্ধগুলিতে তিনি আরো সুসম্বদ্ধভাবে 'Nationalism' সম্পর্কে তাঁর বিচার বিশ্লেষণ রাখলেন। এক জায়গায় তিনি বললেন :

"The Nation, with all its paraphernalia of power and prosperity, its flags and pious hymns, its blasphemous prayers in the churches, and the literary mock thunders of its patriotic bragging, cannot hide the fact that the Nation is the greatest evil for Nation, that all its precautions are against it, and any new birth of its fellow in the world is always followed in its mind by the dread of a new peril. Its one wish is to trade on the feebleness of the rest of the world, like some insects that are bred in the paralysed flesh of victims kept just enough alive to make them tooth some and nutritious. Therefore it is ready to send its poisonous fluid in to the vitals of the other living peoples, who, not being nations, are harmless. For

this the Nation has had and still has its richest pasture in Asia." [Nationalism—p. 29-30]

দৃপ্তকণ্ঠে কবি ঘোষণা করলেন, মহাযুদ্ধেই জাতীয়তাবাদের অন্তিমকাল সূচিত হয়েছে। তিনি বললেন :

"In this war the death-throes of the Nation have commenced···It is the fifth act of the tragedy of the unreal." [p. 44]

রণোন্মত্ত ইওরোপের জাত্যাত্মম্ভরিতাকে এতখানি কঠোর ভাষায় আর কেউ ভর্ৎসনা ও অভিসম্পাত জানান নি। স্মরণ রাখা দরকার ঠিক ঐ একই সময়ে লেনিন তাঁর বিখ্যাত ঐতিহাসিক নিবন্ধ 'Imperialism' গ্রন্থ রচনা করছেন। উভয়েরই আক্রমণের লক্ষ্য একই এবং সেটা হচ্ছে ইওরোপের পুঁজিবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী সভ্যতা। কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গির বিরাট পার্থক্য।

লেনিন তাঁর Imperialism গ্রন্থে বৈজ্ঞানিক অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বহু তত্ত্ব-তথ্য দিয়ে দেখালেন, পুঁজিবাদ তাঁর আপন স্বাভাবিক ধর্মে সাম্রাজ্যবাদে পরিণত হতে বাধ্য হয়েছে আর কয়েকটি বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি পৃথিবীর বাজার আর উপনিবেশের ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে নিজেদের মধ্যে মহাযুদ্ধ বাধাতে বাধ্য আর এই কাজে তারা নিজ নিজ দেশের জনসাধারণকে উগ্র-জাতীয়তাবাদের মদ খাইয়ে মাতাল করে তাদের যুদ্ধের কামানের খোরাক হিসাবে ব্যবহার করছে। অর্থাৎ ইওরোপের সাম্রাজ্যবাদী ও যুদ্ধবাদী সভ্যতার উৎপত্তির কারণ তার পুঁজিবাদী সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যের মধ্যে নিহিত।

বলা বাহুল্য, সে-যুগে আমাদের এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি পাওয়ার কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদকেও পরিষ্কার দেখতে পেয়েছিলেন ; কিন্তু তিনি ন্যাশনালিজমকেই যুদ্ধ, সাম্রাজ্যবাদ ও যত কিছু অনিষ্টের মূল কারণ বলে অভিহিত করলেন। যেন কোনো সাম্রাজ্যবাদী দেশ তার 'জাতীয়তাবাদী' আদর্শ পরিত্যাগ করতে পারলেই সাম্রাজ্যবাদ ও যুদ্ধের প্রবল তাড়না বা তাগিদ থেকে রেহাই পেতে পারে। এই সব দিক থেকে বিচার করলে, তাঁর 'ইম্পীরিয়লিজম', 'লড়াইয়ের মূল', 'বাতায়নিকের পত্র' প্রভৃতি প্রবন্ধগুলিতে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ও বিচার বিশ্লেষণ আপেক্ষিকভাবে

অধিক বিজ্ঞান-ঘেঁষা হয়েছে। অবশ্য 'বাতায়নিকের পত্র'তে সাম্রাজ্য-বাদের বাহ্যিক ও মৌলিক কারণগুলির বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করলেও তিনি মাঝে মাঝে মানুষের লোভ ও রিপুর প্রবল তাড়নাকেই যত অনিষ্টের মূল বলতে চেয়েছেন। এক কথায় তাঁর চিন্তার মধ্যে তখনো একটা অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বিভ্রান্তি চলেছিল। কখনো তাঁর মনে হয়েছে, সর্বনাশের কারণটা হচ্ছে মানুষের spiritual, moral, ideal বা cultural অধোগতি ও অবনতির জন্য, কখনও বা মনে করেছেন socio-economic and political কারণের জন্য। এই অন্তর্দ্বন্দ্বের হাত থেকে তিনি মৃত্যুর শেষ দিন পর্যন্তও রেহাই পান নি।

কিন্তু পরাধীন ও ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে যে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের একটি বিশেষ প্রগতিশীল এবং ঐতিহাসিক ভূমিকা আছে—একথা রবীন্দ্রনাথ তখনও খুব পরিষ্কার বুঝে উঠতে পারেন নি। এমন কি তাঁর 'Nationalism in India' ভাষণেও তিনি পরিষ্কার বলিষ্ঠ কণ্ঠে ভারতের জাতীয় আত্মকর্তৃত্বের দাবিটিও রাখতে ভুল করলেন। অবশ্য এর অনতিকাল পরেই দেশে প্রত্যাবর্তনের পর 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' নামক প্রবন্ধে তিনি ভারতের জাতীয় আত্মকর্তৃত্বের দাবিটি পরিষ্কার ঘোষণা করলেন। কিন্তু আদর্শের ক্ষেত্রে ভালো মনে কোনোদিনই তিনি 'জাতীয়তাবাদ'কে গ্রহণ করতে পারলেন না। পরন্তু এই সময় থেকেই তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের মিলন—সর্বদেশ এবং আন্তর্জাতিক মিলনের উপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করে দেশের মধ্যেই আলোড়ন তুলতে লাগলেন। মহাযুদ্ধের বীভৎসতার মধ্যেই কবি সর্বজাতিক মিলন-কেন্দ্র হিসাবে 'বিশ্বভারতীর' পরিকল্পনা করলেন। এর পর থেকে 'বৈদিক হিন্দুসভ্যতা' কিংবা 'বিশুদ্ধ ভারতীয় জাতীয় সংস্কৃতি' নিয়ে আর কোনদিনই তাঁকে মাথা ঘামাতে দেখা যায় না—যদিও ঋষি বাক্য ও উপনিষদের মহান শ্লোকগুলির উপর মৃত্যুর শেষদিন পর্যন্তও ছিল অসীম শ্রদ্ধা। পৃথিবীর প্রতিটি দেশের শ্রেষ্ঠ সব কিছু গ্রহণীয়কে আহরণ করে দেশকে ও জাতিকে তা আত্মস্থ করবার কথাই তিনি বলে এসেছেন। আবার 'ন্যাশনালিজম'-এর যেটুকু ভালো দিক সেটুকুও স্বীকার করে তার যথার্থ মর্যাদা দেবার জন্য বলে এসেছেন।

এই প্রসঙ্গে সর্বশেষে, কবির একটি রচনার উদ্ধৃতি দিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ১৯৩০ সালে জেনেভায় যখন কবিকে Nationalism and

Internationalism সম্পর্কে তাঁর ধারণার কথা ব্যক্ত করবার জন্য অনুরোধ করা হয় তখন তিনি বললেন :

"Nationalism when sober is right. The idea that man should have no self at all is wrong, we cannot get rid of ourselves, we can get rid of our selfishness. In the same manner, nationalism when it is not the right spirit of a nation is like sentimentalism. Sentiments are not wrong in themselves, but a certain excess of sentiment is termed sentimentalism. In the same way a nation has its own self and that is valuable, we all have that difference. That is where we have the responsiblity to offer the best that we have to humanity. That very right of our national self should urge us to make the best contribution to the world."

এইটাই হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের Nationalism সম্পর্কে পরিণত চিন্তার প্রকৃত রূপ।

কিন্তু তবুও—" 'Nationalism' হচ্ছে একটা ভৌগলিক অপদেবতা"—ন্যাশনালিজম সম্পর্কে কবির ধারণার কথা বলতে গেলেই সর্বপ্রথমে কবির ঐ উক্তিটি বার বার মনে আসে। এমন কথা—এমন সংজ্ঞা পৃথিবীর আর কারুর কাছ থেকে বোধহয় শোনা যায়নি।

পু স্ত ক প রি চ য়

স্বপ্ন ॥ অন্নদাশঙ্কর রায়। ডি. এম. লাইব্রেরি। পাঁচ টাকা ॥

প্রমথ চৌধুরীর মেজাজ নিঃসন্দেহে গদ্যের মেজাজ—কিন্তু তাই তার একমাত্র পরিচয় নয়। বরঞ্চ বুদ্ধির শিখায় উজ্জ্বল পথে যুক্তির দৃঢ় শৃঙ্খলার চর্চা করেছেন বলেই রূপান্বেষায় দৃঢ়বন্ধনকে তিনি অঙ্গীকার করেছিলেন সর্বতোভাবে। এই দৃঢ়বন্ধনের প্রতি আনুগত্যের আর এক প্রমাণ তিনি রেখে গেছেন তাঁর সনেটগুলিতে। চৌধুরী মহাশয়ের বুদ্ধি-প্রখর পথের প্রধান পথিকের মধ্যে অতুলচন্দ্র গুপ্ত, ধূর্জটিপ্রসাদ ও অন্নদাশঙ্কর অন্যতম। এঁরা বাংলা গদ্যের বিরল পাদপ তৃণভূমিতে ঋজুসংহত শাল-মহিমায় বিরাজিত। এর মধ্যে আশ্চর্যের বিষয় এই যে অন্নদাশঙ্কর তাঁর কীর্তির জন্য মুখ্যত তাঁর গদ্যের ওপর নির্ভরশীল হলেও—কবিতায় তাঁর স্বস্তির আশ্রয়কে সোৎসাহে ঘোষণা করতে কখনো পরাঙ্মুখ নন। অন্তঃশীলায় কবির মেজাজকে ধূর্জটি-প্রসাদ কখনো কখনো জানিয়ে ফেললেও, এ পর্যায়ে একমাত্র অন্নদাশঙ্করকেই দেখা যায় যে প্রকাশ্যে কবিতা রচনার কোনো উপলক্ষকেই তিনি অবহেলা করেন না। সঙ্গে সঙ্গে লক্ষণীয় যে তিনি চৌধুরী মহাশয়ের ন্যায় সনেটের দৃঢ় বন্ধনকে অনুশীলন না করেই, কিছুটা প্রায় উপেক্ষা করেই, তাঁর কবিত্বের পটাকাশে লিরিকের নানাকৃতি মেঘমালার সমাবেশ ঘটিয়েছেন। অন্নদাশঙ্করের যে কোনো শিল্পকর্মের আলোচনায় এই প্রাথমিক সূত্রটি বিশেষ স্মরণীয়। বাংলা লোকসাহিত্যের বিভিন্ন ধারা থেকে রসাস্বাদনে অন্নদাশঙ্করের ক্লান্তি নেই। ছড়া লিখতে আলস্য নেই। রূপকের প্যাটার্ন গ্রহণেও তিনি যেমন নির্ভয়, রূপকথার ভাবলোকের ব্যবহারেও তিনি তেমনি আগ্রহী। লোক-জীবনের দেশজ ধারায় অবগাহন ব্যতীত যে বাবু-বিকারের হাত থেকে মুক্তি নেই—শুদ্ধতার সন্ধানেই যে আমাদের ক্লাসিক এবং দেশজ লোকায়ত রসচর্যাকে আশ্রয় করা দরকার, তবেই যে দেড় শত বৎসরের ঔপনিবেশিক পঙ্গু মধ্যবিত্তের জীবনধারণা-ধারণার হাত থেকে রেহাই—রবীন্দ্রনাথে এ নির্দেশ স্পষ্ট, কবি বিষ্ণু দে-র চলিষ্ণু কবিত্বে তারই মহৎ উত্তরাধিকার।

অন্নদাশঙ্করও হয়তো তাই ভাবেন। তাই লোকসাহিত্যের ভাবভঙ্গিকে তিনি বারে বারে অনুশীলন করতে চান। কথাসাহিত্যিক হিসাবে একটা কথা তিনি স্পষ্ট বুঝেছেন যে আমাদের ছবিকে সমগ্র করে তুলতে হলে আমাদের ভাবলোকের সমগ্র প্রতিফলন দরকার। সেই ভাবলোককে কবি-মন নিয়ে অন্নদাশঙ্কর ভালোবেসেছেন। রাধাকৃষ্ণের প্রেমকথা, হাসনসখি, কিরণমালার নিজস্ব জগৎ এ সব কিছু যেমন তাঁর কল্পনাকে দুলিয়েছে তেমনি তাঁর মধ্যে সঞ্চার করেছে এক বিচ্ছিন্নতার যন্ত্রণা। তাই বারে বারে নায়ক নায়িকার জীবনসূত্রে তিনি দেশের ঐতিহ্যগত ভাবলোককে গ্রথিত দেখতে চান। সত্যাসত্য-এ রূপক-নির্মিতির প্রয়াসের মূল প্রেরণা এখানে। হাসন-সখিতে, রত্ন ও শ্রীমতীতে দেশের ভাবলোকের ব্যবহার এই উদ্দেশ্যে। স্বভাবতই এটা অন্নদাশঙ্করের মাত্র রুচি-বিলাস নয়। দেশ কালের একটা অংশকে নয়, গোটা দেশকে, তার আবহমান কালকে অন্নদাশঙ্কর পাত্র-পাত্রীর জীবনে উপলব্ধি করতে চান। তাঁর ব্যর্থতা নিশ্চয় আছে। কিন্তু তাঁর বিষয়-চেতনাকে ভালোবাসবে না এমন সমালোচক নিশ্চয় কেউ নেই।

সুখ উপন্যাসের নায়িকার নাম মালা। রূপকথার নায়িকা কিরণমালার নামে তার নাম। মালার বাবা চান মালাকে এমন শিক্ষায় সম্পন্ন করতে যাতে ব্যক্তি হিসাবে পূর্ণতা অর্জন করা তার পক্ষে সম্ভব হবে। মা মনে করেন সে শিক্ষায় কী লাভ যে শিক্ষা তাঁর মেয়েকে মেয়ে হিসেবে সার্থকতার পথে নিয়ে যাবে না। বাবা চান মেয়ে মনুষ্যত্ব অর্জন করুক। মা চান মেয়ে বধূত্বের গৌরবে ভূষিত হোক। স্বভাবতই মায়ের সংসার-বুদ্ধিই এক্ষেত্রে প্রাধান্য বিস্তার করে। মালার জন্য পাত্র খোঁজাখুঁজি শুরু হয়। এ ব্যাপারে উৎসাহী সহায়ক শিল্পী দেবপ্রিয়—যে মালার মাকে বলে মাসিমা, বাবাকে মেসোমশাই, মালার রূপে যে দেখে শিল্পের বৈভব। পিতার ভাবলোক থেকে নেমে এসেছে যে মেয়ে তার বর যোগাড় করা সোজা নয়। মালার স্বয়ম্বর পরীক্ষা পেরিয়ে যাওয়া পাণিপ্রার্থীদের পক্ষে সম্ভব হল না। ইতোমধ্যে যুদ্ধ-দুর্ভিক্ষ, দেশবিভাগ-দাঙ্গা নানা বিপর্যয়ের ভেতর দিয়ে বাঙলাদেশকে পেরিয়ে যেতে হচ্ছে। মালাদের পরিবারকেও মাঝে মাঝে সে আগুনের আঁচ স্পর্শ করল। শিল্পী দেবপ্রিয় দায়ে অদায়ে এই পরিবারের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে—নির্লোভের নিরাসক্তি নিয়ে। আর মালা মাঝে মাঝে উচ্চারণ করেছে তার অদ্ভুত আত্মপ্রত্যয়—সে মায়া পাহাড়ে যাবে। আনবে সোনার শুক-

পাখি, মুক্তাঝরার জল। মালা নিবিষ্টভাবে দেবপ্রিয়কে বলেছিল—অরুণ বরুণ কিরণমালা। কিরণের মতো আমিও চলেছি মায়াপাহাড়ের পথে। দুর্গম পথ। পাথরের পর পাথর। যত সব পথিক রাজপুত্র। পথে প্রাণ দিয়েছে। আনতে হবে মুক্তাঝরার জল। সে জল ছিটিয়ে দিলে ওরা বাঁচবে। আনতে হবে সোনার শুকপাখি। সে পাখি ঘরে নিয়ে ওরা সুখী হবে। পারব কি আমি আনতে? পারব কি ওদের বাঁচাতে ও সুখী করতে? না ও:দেরি মতো পাথর হয়ে যাব? মালার এই ভাবাবেশ উপন্যাসের সমগ্র সুর-সংহতির মূলে অনেকখানি বারিনিষেক করেছে। ভারত-ইতিহাসের রক্তাঙ্কিত বন্ধুর উপত্যকায় মালার প্রত্যয়-গম্ভীর ঘোষণা নৈতিক পুনরুজ্জীবনের মতো ধ্বনিত হয়েছে। সুতরাং মালা সেই রূপকথার রাজপুত্রের মত কাউকে যদি না পায় স্থগিত রাখবে তার বরমাল্য দান। নানা অভিজ্ঞতার শেষে মালা যখন মালার মতোই একটা মেয়ে হিসেবে নিজেকে উপলব্ধি করল তখন শিল্পী দেবপ্রিয় একদিন তাকে চমকে দিয়ে নিজেকে নিবেদন করে—"তোমার চোখের সামনেই একটা পাথর পড়ে আছে। সে রাজপুত্র না হলেও তুমি তাকে জীবন দিতে পারো।" মালা উত্তর দেয়—"তুমি রাজপুত্রই। রূপলোকের রাজপুত্র।" বই এখানেই শেষ নয়। গান্ধিজী হত হলেন। সারা ভারতের শোকের মুহূর্তে বিহ্বল মালা সান্ত্বনা খুঁজে পেল গান্ধিজীর আত্মদানের সার্থকতায়। সে বলল—(স্বস্তি) "পেলুম এই কথা জেনে যে পথিকদের একজন এতদিনে মায়াপাহাড়ে পৌঁছে গেছেন। নিয়ে এসেছেন মুক্তাঝরার জল। ছিটিয়ে দিয়েছেন পাথরের গায়ে। তার পর অদৃশ্য হয়ে গেছেন।" এখন বাকি থাকে সোনার শুক-পাখি। সেটি আনতে যাবে কে? মালা তারও জবাব দিল দেবপ্রিয়কে। বলল—"সেটি আনতে যেতে হবে মায়াপাহাড়ে নয়। রূপলোকে। সেও এক মায়ার রাজ্য। সেখানে যাবে তুমি।" মানুষের সংগ্রাম আর শিল্পীর সংগ্রামের নৈতিক তাৎপর্যের উপলব্ধিতে বই সমাপ্ত হল। সমস্ত উপন্যাসের অনিবার্য রস-পরিণাম রচনা করেছে মুক্তার মতো জমাট গদ্য! আর তার অন্তরাশ্রয়ী কবিত্বের দ্যুতি, সেই রসলোকের অক্ষয় দান। দেবপ্রিয়ের শেষ তিনটি সম্বোধন, দেবি, সখি ও প্রিয়ে যেন তিনটি সোপান পাঠককে নিয়ে যায় আনন্দের মহাকাশের কাছে। এখন এর অন্তরলোকের পরিচয় গ্রহণ করা যাক।

এ সংক্ষিপ্তসার থেকে বোঝা যাচ্ছে যে মালা এ উপন্যাসের প্রধান চালিকাশক্তি। মালাকে স্পষ্ট করে তোলার ওপরে উপন্যাসের সার্থকতা নির্ভরশীল। সে কথা উপলব্ধি করেই অন্নদাশঙ্কর মালাকে প্রথাগত পরিবেশের হাত থেকে সরিয়ে তাকে মানুষ হতে দিয়েছেন তার পিতৃমানসলোকে। মালার বাবা মালাকে প্রকৃতি চিনিয়েছেন। সদসৎ-এর পার্থক্য বুঝিয়েছেন। বলে দিয়েছেন কী গ্রাহ্য, কী ত্যজ্য। তাই বলে মালা কিন্তু তার বাবার অনুকৃতি নয়। শাশ্বত নারীত্বের প্রাণময়ী শক্তিতে সে বিশিষ্ট হয়ে উঠতে চাইল। এই ওঠাটা উপন্যাসের আধারে ঠিক ভাবে আধারস্থ হয়নি বলে উপন্যাসের মাঝের অংশ বেশ দুর্বল হয়ে পড়েছে। লেখক নিশ্চয় জানতেন যে মালাকে কিরণমালার আদর্শে গড়ে তোলার ওপরে বেশি জোর দিলে কিরণমালা-পরিকল্পনা প্রাধান্য বিস্তার করবে। তাহলে আদর্শের কাছে জীবন্ত মানুষটা গৌণ হয়ে পড়বে। তখন তা হবে দুষ্ট শিল্প বা 'ব্যাড্ আর্ট'। এই সঙ্কট থেকে মালাকে বাঁচানোর জন্য লেখক কিরণমালা-প্রসঙ্গকে মালার ভাবলোকের বিষয় করেছেন। তার মনোলোকের সঙ্গে রূপকথার বিশ্বাসের জগতের সম্পর্ক সম্বন্ধে উপন্যাস নীরব। এই নীরবতা না থাকলে, রূপকথার জগৎচারিণী মালার মনোলোক উপন্যাসের বিষয় হলে, লেখককে সে ক্ষেত্রে স্কীমের আতিশয্যের হাত থেকে বাঁচার জন্য বদলাতে হত প্রসঙ্গ-প্রকরণ সবই। কিন্তু সে অভিপ্রায়ের লোভে লেখক তাঁর সরল সুন্দর বক্তব্যকে ছাড়তে স্বীকৃত নন। কাজেই মালার ভাবলোকই হল তাঁর বিষয়। সরল প্রসঙ্গ প্রকরণেই তিনি রইলেন সন্তুষ্ট।

এবং আমরা সকলে জানি এ বিষয় অন্নদাশঙ্করেরই বিষয়। এ কথা ঠিক নয় যে অন্নদাশঙ্করের মানুষগুলো শুধু কথা বলে। এও ঠিক নয় যে তারা শুধুই ভাববিলাসী, কাজেই বাক্যবিলাসী। তারা কথা বলে, প্রচুর বলে, সুন্দর বলে—কিন্তু সে কথাগুলো তাদের চরিত্রের অংশ। কথার ভিতর দিয়ে তারা তাদের বুদ্ধিপ্রধান ভাবনাকে প্রকাশ করে বটে, কিন্তু সে ভাবনার দ্বারাই তারা বিশিষ্ট হতে চায়। এর শক্তি এবং সীমাবদ্ধতা দুয়ের বিষয়েই অন্নদাশঙ্কর সচেতন। তাই দেখা যায় তাঁর উপন্যাসেই তিনি ভাবনা-প্রধান চরিত্রগুলির পাশে পাশে এমন এক-আধটি চরিত্রের উপস্থাপনা করেন যারা একান্তই সহজ গোত্রের মানুষ। সত্যাসত্য-এ সে দৃষ্টান্ত আমরা দেখেছি। সুখ উপন্যাসে এ বিষয়ের আরো শক্তিশালী নিদর্শন আমরা পেলাম। মালা ছাড়া এই উপন্যাসে যিনি আমাদের ক্ষণে ক্ষণে মুগ্ধ করেছেন তিনি মালার

মা। এই সহজ স্বাভাবিক সাংসারিক চেতনাসর্বস্ব মহিলাটি, উপন্যাসের উপসংহারে দেবপ্রিয় মালাকে বিবাহের প্রস্তাব করলে,—দেবপ্রিয় তুমি—বলে যে কান্নাটি কেঁদেছেন তাতে মালার কাব্যময় উক্তি ভেসে গেছে। মালার মা উপন্যাসে আছেন বলেই উপন্যাসে আর সকলকে সঙ্গত বলে মনে হয়। যে যতই বাড়াবাড়ি করুক আমরা নিশ্চিন্ত থাকতে পারি মালার মা আছেন, তিনি ঠিক সময়ে ঠিক মন্তব্যটি করবেন। মালা দেবপ্রিয়কে শেষ আশ্বাসে বলেছে যে সে দেবপ্রিয়কে সংসারের ধান্দা থেকে বাঁচাবে—এ প্রতিশ্রুতির শক্তি সত্যই মালা কোথায় পেয়েছে তা জানতে হলে তাকাতে হবে মালার মায়ের দিকে। মালার বাবার শিক্ষা মালাকে টানলেও, সে টানে পথ চলবার শক্তি মালার মায়ের জীবন থেকেই সে পেয়েছে। মালা এবং মালার বাবার সম্পর্কে এক্ষেত্রে আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় সত্যাসত্য উপন্যাসের উজ্জয়িনী এবং উজ্জয়িনীর বাবার কথা। কিন্তু মিলটুকু এই পর্যন্তই। বরঞ্চ উজ্জয়িনীর সঙ্গে মালার অমিল অনেক বেশি চোখে পড়ে। উজ্জয়িনী খুঁজতে বেরিয়েছিল নিজের ভালোবাসার সার্থকতা। পক্ষান্তরে মালার অন্বিষ্ট শুধু নিজেকে ঘিরে আবর্তিত নয়। এ দিক থেকে মালা অন্নদাশঙ্করের নায়িকা-পর্যায়ে আর এক অগ্রসর সৃষ্টি। কিন্তু এই নায়িকা অন্নদাশঙ্করেরই নায়িকা। উজ্জয়িনী এবং মালার আকাঙ্ক্ষা এবং প্রাপ্তিতে, বাসনা আর তৃপ্তিতে ব্যবধান সহজে দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্তু কী করে চাইতে হয়, প্রমাণ করতে হয় চাওয়ার শক্তিকে—সে ব্যাপারে দুজনেই সমান চঞ্চল, সমান তৎপর, সমান নিঃশঙ্কিনী। এ ধরনের নায়িকা সৃষ্টি বাংলা সাহিত্যে অন্নদাশঙ্করের অন্যতম দান। এরা বারে বারে জীবনের ভাঙাগড়া টানাপোড়েনের দায়ে নিজেদেরও ভাঙে গড়ে।

এ উপন্যাসে আগেই বলেছি যে এই ভাঙাগোড়ার ব্যাপারটি আমাদের সর্বত্র প্রত্যয় উৎপাদন করে না। কিরণমালার গল্প কেমন করে মালার মনে দানা বাঁধল এবং কেমন করে কিরণমালা থেকে আবার সে মালা হয়ে গেল লেখক সে ব্যাপারটি সম্বন্ধে যেন তত আগ্রহী নন। অথচ এটা যে একটা প্রধান ব্যাপার বারে বারে হাড়ের পাহাড় রক্তের নদীর প্রসঙ্গ ফিরে আসায় তা বোঝা যায়। লেখক মালাকে দুরূহ সাধনায় ব্রতী করাতে চান কিন্তু নিজে প্রসঙ্গ প্রকরণের ব্যাপক ও গভীর পরীক্ষায় সাহসী হলেন না কেন তা বোঝা গেল না। উপন্যাসের শেষের দিকে যখন রূপকথার অতি ক্ষীণ ফ্রেমটুকুও ভেঙে গেল—ওবং তা ভেঙে না গেলে লেখকের জীবন-ব্যাখ্যা পূর্ণার্থ লাভ

করত না—তখন সে ভাঙনের কোনো প্রতিক্রিয়া আমরা অনুভব করি না। আমাদের কাছে দেবপ্রিয়র সোনার শুকপাখি আনতে যাওয়ার প্রসঙ্গটা শুধু কথা। সেই কথার সামনে মালা তার সমগ্র চতুষ্পার্শ্বের যন্ত্রণাময় হিংসা আর হননকে ভুলতে পারল যে-রূপলোকের প্রসঙ্গে সে-রূপলোক সম্বন্ধে তার আগ্রহের স্বরূপ সম্বন্ধে আমরা পূর্ব-পরিজ্ঞাত নই। ফলে মালার পরিশেষ বা উপসংহারে চতুরঙ্গ-র দামিনীর ন্যায় স্বাভাবিকের সন্ধান প্রধান হয়ে উঠল না এটা দেখতেই পেলাম—অথচ তখনও যে-দুরূহ-ব্রতের সে সন্ধানী তাকে ভালো করে চেনা গেল না।

অন্নদাশঙ্কর নিশ্চয় সমালোচকের সান্ত্বনার ধার ধারেন না। আমাদেরও স্পর্ধা নেই যে তাঁকে সমালোচনার উপসংহারে পেশাদার সান্ত্বনা দেব। তাহলেও সত্যার্থেই এই কথা বলা দরকার যে সুখ বাংলা কথা-সাহিত্যের থোড়-বড়ি-খাড়া আর খাড়া-বড়ি-থোড়ের রাজত্বে উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। ভালো-লেগেছে বলেই মনের কথা সব বলতে চেয়েছি। বইটির ভূমিকাতে লেখক বলেছেন রূপকথার নির্যাস নিয়ে কাহিনী রচনার সাধ ছিল। ভূমিকার শেষ অনুচ্ছেদে বলেছেন "সুখ যদিও রূপকথার নির্যাস দিয়ে গঠিত তবু নিজে একটি রূপকথা নয়। সে অভিলাষ আমার অপূর্ণ রয়ে গেল।" শেষ উক্তিটির জন্য মনে হয় যে বোধহয় শুধু নির্যাস নয়—রূপকথার কাঠামোর ব্যবহার সম্বন্ধেও লেখকের কোনো অভিপ্রায় থেকে থাকবে। Hardy-র উপন্যাস প্রসঙ্গে সমালোচকেরা তাঁর উপন্যাসের ballad tale-এর প্যাটার্নের কথা বলেন। উপন্যাসে লোকসাহিত্যের নির্যাস এবং বিন্যাস দুয়ের ব্যবহারের পূর্ব নিদর্শন বিদ্যমান। লেখক যদি 'কিরণমালা'র সমগ্র প্যাটার্নকে উপন্যাসের আধারে মিলিয়ে মিশিয়ে নিয়ে একালের গল্প বলতেন তাহলে গভীরতর সার্থকতার সন্ধান তিনি পেতেন। লোকসাহিত্যের প্যাটার্ন এবং নির্যাস লোক-জীবনের নিজস্ব পরিবেশের আপন সম্পদ। পাত্রপাত্রীকে যদি সেখানে স্বয়ম্ভু বলে মনে হয় তবে সে প্যাটার্ন ও নির্যাস বৃহত্তর তাৎপর্য বহন করে না। মেসোমশাই বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিত্ব। মালাদের পরিবারও বাঙালী গেরস্থ পরিবারের প্রতিনিধি নয়। ফলে পটভূমিকাতেই লোকসাহিত্যের আত্মার সমর্থন ছিল না। অপূর্ণ সাধকে পূর্ণ করার জন্য অন্নদাশঙ্করকে পূর্ণতর প্রয়াস করতে হবে। তাঁকেই করতে হবে। কেন না সেই ভাষা তাঁর হাতে আছে। সেই অনুরাগ তাঁর মনে আছে। সেই জীবনবোধ তাঁর হৃদয়ে আছে। যার

ফলে তিনি বলতে পারেন: "এ যেন অমাবস্যার রাত্রে একটি রওমশাল জ্বালানো। সঙ্গে সঙ্গে অমাবস্যা হয়ে যায় দেয়ালী।" মনে পড়ে যায় বিষ্ণু দে-র বিখ্যাত উক্তি:

"জ্বালাও দীপাবলী, অমার রেশ
স্বচ্ছ উষা বটে মুছবে কাল—
আমার প্রেম জ্বালো, আঁধার দেশ
আঁধার পৃথিবীতে ক্ষেতে কলে
খামারে কারখানায় এ অমাবস্যা
মিলাও দেয়ালীতে বিলাও শেষ॥"

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের উত্তরাধিকার॥ সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার। র‍্যাডিক্যাল বুক ক্লাব। তিন টাকা॥

রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষ উপলক্ষে রবীন্দ্রচর্চার দেশব্যাপী উৎসাহ স্বাভাবিক। বিশ্বের সর্বত্র যখন রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব ও মনীষা অভিনন্দিত হচ্ছে, তখন স্বদেশবাসীরা তাঁকে নিয়ে বেশি উচ্ছ্বসিত হলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। নানা পত্র পত্রিকার বিশের সংখ্যা ছাড়াও অনেক স্মারক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদারের রবীন্দ্রনাথের উত্তরাধিকার গ্রন্থটিও সুবিশাল রবীন্দ্রকীর্তির পর্যালোচন।

লেখক ইতোমধ্যে ভাষা ও জাতিসমস্যা বিষয়ে কয়েকটি সুচিন্তিত প্রস্তাব লিখে সুধীমহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের উত্তরাধিকার গ্রন্থটিও তেরোটি প্রস্তাবের সমষ্টি। প্রস্তাবগুলি নাতিদীর্ঘ; বক্তব্য প্রাঞ্জল। অন্ধ সংস্কার-প্রবণতার বিরুদ্ধে, মানুষের অপমানের বিরুদ্ধে, হিন্দু-মুসলমান সমস্যা, অপরাজেয় মানবতাবাদ প্রভৃতি অধ্যায়ের বক্তব্য সময়োচিত হয়েছে। উপনিষদের কবি, ভূমার কবি, অরূপরসিক ইত্যাদি অভিধায় রবীন্দ্রনাথকে "খ্যাতির মঞ্চে সংকীর্ণ বাতায়নে" বন্দী করে রাখা হয়। রবীন্দ্রনাথ যেন সত্য-শিব-সুন্দরের অলৌকিক আলোর প্রতীক, জীবন সংগ্রামের কেউ নন। সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদারের গ্রন্থটি সেই ভ্রান্ত ধারণা নিরসনে সহায়ক হবে। রবীন্দ্রনাথের রচনা থেকে প্রাসঙ্গিক প্রচুর উদ্ধৃতি থাকায় যাঁরা কবির সুবিপুল প্রবন্ধসম্ভারের সঙ্গে পরিচিত নন, তাঁরাও উপকৃত হবেন!

কিন্তু লেখকের উপস্থাপনারীতি খুবই ত্রুটিপূর্ণ। ভাষায় সাংবাদিক দ্রুততা এবং বক্তৃতার চিহ্ন প্রায় সর্বত্র। বিশ্লেষণ অল্প বলে লেখকের মন্তব্যগুলির উগ্রতা অহেতুক মনে হয়। লেখক বলেছেন, "প্রথমতঃ, দেখা উচিত যে তাঁর চিন্তার অগ্রগতি কোন পর্যায়ে এসে থেমে গেছে, না, এগিয়ে চলেছে এবং দ্বিতীয়তঃ, এগিয়ে গেলে তা গতির ছন্দে সেই বিশেষ শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গীর গণ্ডীকে অতিক্রম করে অগ্রসর হয়ে চলেছে কিনা।…যদি রবীন্দ্রনাথকে অন্তরের শ্রদ্ধার অর্ঘ্য নিবেদন করতে বসে তাঁর অসঙ্গতিগুলিকে না দেখি তবে যাঁরা অধ্যাত্মবাদী ধারাটিকেই প্রাধান্য দেন তাঁদের জবাবে কিছু বলার থাকে না। আবার যদি অসঙ্গতি খোঁজার চেষ্টাটাই বড় হয়ে ওঠে তাহলে রবীন্দ্রনাথের সুমহান অবদানকে বোঝাও সম্ভব হবে না এবং তাঁর উত্তরাধিকারকে কাজে লাগানোর পথে প্রবল অন্তরায় সৃষ্টি হবে। সেক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি সেই উত্তরাধিকারের অপব্যাখ্যা করার সুযোগ পাবে।" (৭৯ পৃঃ) বক্তব্য যথার্থ ; রবীন্দ্রভাষ্য রচনার পূর্বে লেখকের এরূপ দৃষ্টিভঙ্গি অঙ্গীকার করা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু এ ধরনের মন্তব্য রবীন্দ্রসাহিত্যচর্চা নয়, রবীন্দ্রনাথের উত্তরাধিকার তো নয়ই। যান্ত্রিক বিচারের ভ্রান্তি সম্পর্কে পাঠকদের অবহিত করলেও সত্যেন্দ্রবাবু নিজে প্রায়শ যান্ত্রিক বিভাজনের ছকে আটকে পড়েছেন। 'সঠিক দ্বন্দ্ব-মূলক পদ্ধতি' বলতে তিনি কি বুঝিয়েছেন জানি না, লেনিনের 'তলস্তয় প্রসঙ্গে' প্রবন্ধগুলিতে বোধহয় দ্বন্দ্বমূলক সাহিত্য-বিচারের সার্থক নিদর্শন আছে। সত্যেন্দ্রবাবু সে-রীতি আশ্রয় করে লিখলে মার্কসবাদী লেখকদের রবীন্দ্রচর্চার একটি অভাব পূরণ হত।

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে যুক্তিবাদী, মানবতাবাদী অভিধা সম্প্রোচ্চারিত নয়, অথচ সত্যেন্দ্রবাবু রবীন্দ্রব্যক্তিত্বের ঐ দিকগুলি শুধু স্পর্শ করে গেছেন, আলোচনা করেন নি। "তিনি ছিলেন একাধারে ঋষি ও কবি।"—এ ধরনের বাক্য আকস্মিক (৬ পৃঃ) মনে হয়। তবু রবীন্দ্রনাথের উত্তরাধিকার সাধারণ পাঠককে ভ্রান্তি নিরসনে সাহায্য করবে। গোষ্পদে মহাকাশ প্রতিবিম্বিত করা দুরূহ কর্ম। সেই কর্মের যথাসাধ্য প্রয়াস করেছেন সত্যেন্দ্রবাবু। মানুষের অপমানের বিরুদ্ধে, হিন্দুমুসলমান সমস্যা, অপরাজেয় মানবতাবাদ রবীন্দ্রসাহিত্যপাঠের সৎ নির্দেশিকা।

রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত

মধুসূদন (অন্তর্জীবন ও প্রতিভা)॥ শশাঙ্কমোহন সেন। প্রতাপ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত। এ. মুখার্জি এণ্ড কোং। চার টাকা॥

মধুসূদন : কবি ও নাট্যকার। সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত। এ. মুখার্জি এণ্ড কোং। সাড়ে তিন টাকা॥

প্রথম বইটি বিখ্যাত পুরাতন বইয়ের পুনর্মুদ্রণ। বইটির গুরুত্ব সম্পর্কে নতুন করে বলবার দরকার করে না। যোগীন বসুর ও নগেন্দ্রনাথ সোমের বই যেমন মধুসূদন সম্পর্কে তথ্যের প্রধান আকর, তেমনি এ বই মধুসূদনের মানস বিশ্লেষণের পথে বলতে গেলে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এর পরে মধুমানস-সন্ধানী যে কটি বই বেরিয়েছে, তার প্রায় সবগুলিই কোনো না কোনো ভাবে এ বই থেকে ঋণ গ্রহণ করেছে এবং অনেকে তাঁদের বইতে শশাঙ্কমোহন সম্পর্কে সকৃতজ্ঞ উল্লেখও করেছেন।

এক হিসেবে সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্তের বই শশাঙ্কমোহনের ঠিক বিপরীত কোটিতে। এ বইতে ডঃ সেনগুপ্ত মধু-মানসের বিশ্লেষণ বা অনুসন্ধান করতে চান নি, সাহিত্যের মহাজন-উক্ত মূল কতকগুলি সূত্রকে অবলম্বন করে মধুসূদনের গ্রন্থগুলির বিচার করেছেন।

বইটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শরৎচন্দ্র স্মারক বক্তৃতামালার সংকলন। চারটি এর ভাগ। প্রথমে মহাকাব্য সম্পর্কে সাধারণ আলোচনা। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে মধুসূদনের মহাকাব্যের আলোচনা। তৃতীয় ও চতুর্থ পরিচ্ছেদে গীতিকাব্য ও নাটকের বিশ্লেষণ।

এর মধ্যে মহাকাব্যের সংজ্ঞা-সন্ধানের আলোচনাটি বিশেষ উপাদেয়। মহাকাব্যের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অ্যারিস্টটল ও প্রাচ্য আলঙ্কারিকদের মতের বিশদ বিচার করেছেন লেখক এই পরিচ্ছেদে। এর থেকে উদ্ভূত সূত্রের প্রয়োগে মধুসূদনের তিলোত্তমা-সম্ভব ও মেঘনাদ বধ-এর পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করেছেন তার পরে। এই অধ্যায় দুটির উল্লেখযোগ্য বিষয় : মেঘনাদ বধ সম্পর্কে কয়েকটি প্রচলিত ধারণার বিরুদ্ধে ডঃ সেনগুপ্তের মত প্রকাশ। যেমন, লক্ষ্মণ কর্তৃক অন্যায় যুদ্ধে মেঘনাদের হত্যা প্রসঙ্গে প্রচলিত মত এই যে এতে রামলক্ষ্মণের কাপুরুষতাকেই যেন কবি দেখাতে চেয়েছেন এবং মেঘনাদ সম্পর্কে তাঁর অতিরিক্ত সহানুভূতির স্বাক্ষরও এটি ; মেঘনাদের

অসহায় মৃত্যুর মধ্য দিয়ে কবি পাঠকের সমস্ত সহানুভূতি আকর্ষণ করেছেন রাক্ষস-পক্ষে। ডঃ সেনগুপ্ত এই মত মানেন নি। তিনি মধুসূদনের স্বপক্ষে ভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁর মতে, ভারতীয় মহাকাব্যের বৈশিষ্ট্যই হল যে তা উচ্চনীতি-বিধৃত। "মধুসূদনের কাব্যে যে লক্ষ্মণকে দেখিতে পাই তিনি এক বিশ্বব্যাপী নৈতিক শক্তির প্রতিনিধি।·· লঙ্কার অধীশ্বরী দেবতা এই নীতির লঙ্ঘনে বিচলিত ···। ···যে মারীচ সীতাহরণে রাবণের সহায়ক হইয়াছিল সে তীব্র অনুশোচনায় দগ্ধ হইয়া নিজের প্রায়শ্চিত্তের বর্ণনা দিয়াছে। বাস্তবিকপক্ষে, যে চরাচরব্যাপী শক্তির কাছে ইন্দ্রজিৎ পরাস্ত হইয়াছেন, লক্ষ্মণ তাহার উপলক্ষ্য মাত্র। লক্ষ্মণের বাহুবলকে প্রাধান্য দিলে এই মহাকাব্যোচিত সর্বব্যাপকতা নষ্ট হইয়া যাইত। ·····যে ধর্মকে পরদার-নিরত পরস্ত্রী-অপহারক রাবণ পদদলিত করিয়াছেন তাহা রাক্ষসেরাও স্বীকার করেন এবং রাক্ষসরাজমহিষী চিত্রাঙ্গদার খেদোক্তিতে তাহার অকুণ্ঠ অভিব্যক্তি পাওয়া যায়।···ভারতবর্ষীয় মহাকাব্যের সর্বাপেক্ষা বড় কথা হইতেছে আদর্শের বিশুদ্ধতা। ভীষ্মের বাহুবল কাহারও অপেক্ষা কম নয়, চরিত্রবলে তিনি সকলের চেয়ে বড়। কিন্তু নৈতিক আদর্শের বশবর্তী হইয়াই তিনি অধর্মের পথ গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং অর্জুনের কাছে তিনি ও অন্যান্য কৌরব সেনাপতিরা যে পরাস্ত হইয়াছেন তাহা বাহুবলের কাছে বাহুবলের পরাজয়মাত্র নহে, উন্নততর নীতির কাছে নিম্নতর নীতির পরাভব। তাঁহাদের ব্যক্তিগত শৌর্য ও ব্যক্তিগত চরিত্রবল এই বৃহত্তর নৈতিক সংঘর্ষকেই চিহ্নিত করিয়া দিয়াছে।"

তৃতীয় অধ্যায় গীতিকাব্যের আলোচনা। এর মধ্যে তিনি বীরাঙ্গনা-কেও অন্তর্ভুক্ত করেছেন। যদি অন্তর্ভুক্ত বীরাঙ্গনাকে গীতিকবির সৃষ্টিই বলি, তবে নিশ্চয়ই এ স্বর এলিয়ট-বর্ণিত "কবির তৃতীয় স্বর।" এ কথাও হয়তো বলা যায় যে আধুনিক বাংলা নাট্যকাব্যের প্রাথমিক সাক্ষাৎ এই বীরাঙ্গনাতেই পাওয়া যাবে। কয়েকটি 'পত্রিকা' এমন নাটকীয় মুহূর্তে বিন্যস্ত, কয়েকটি লিপি-ভাষণ এমন নাট্যগুণান্বিত যে বলতে দ্বিধা থাকে না, এখানে নাটক ও কবিতা একটি সূত্রে বাঁধা পড়েছে। বীরাঙ্গনায় নাট্যকার মধুসূদন ও কবি মধুসূদন সম্মিলিত। মেঘনাদেও এ ঐক্য দুর্লক্ষ্য নয়। এই দিক থেকে বীরাঙ্গনা-র আলোচনায় চমৎকার একটি সুযোগ ছিল। কিন্তু ডঃ সেনগুপ্ত এ দিকটায় দৃষ্টি দেন নি।

অবশ্য গ্রন্থ শেষ করে আরও একটা অতৃপ্তি থেকে যায়ঃ মধুমানস থেকে

একেবারে বিচ্ছিন্নভাবে গ্রন্থগুলির আলোচনা করেছেন সমালোচক। এবং এইখানেই আলোচ্য গ্রন্থ দুটি সম্পূর্ণ বিপরীত কোটির।

চিত্তরঞ্জন ঘোষ

রিয়ালিস্ট রবীন্দ্রনাথ ॥ বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়। বাণী নিকেতন। তিন টাকা ॥

বিদ্রোহী রবীন্দ্রনাথ ॥ বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়। বাণী নিকেতন। তিন টাকা ॥

আলোচ্য গ্রন্থদুটিই তৃতীয় সংস্করণের মুখ দেখছে। সুতরাং পাঠক মহলে গ্রন্থদ্বয় নিজগুণেই সুপরিচিত। বেশ কিছু কাল আগে প্রাবন্ধিক হিসাবে বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় তরুণ মহলে বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন এবং তাঁর অজস্র পাঠক নতুন রচনার জন্য সাগ্রহে প্রতীক্ষা করত। বর্তমান সমালোচকও তাদের অন্যতম। রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে শ্রীচট্টোপাধ্যায়ের গ্রন্থদুটি আবার প্রকাশিত হয়েছে। এটা নিশ্চয়ই সুখের বিষয়। বিদ্রোহী রবীন্দ্রনাথ-এ রবীন্দ্র প্রতিভার বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে এবং রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং শ্রী চট্টোপাধ্যায়ের বিশ্লেষণকে সঠিক বলেছেন। কিন্তু সাম্প্রতিক চিন্তা এবং সংগৃহীত তথ্য ও তত্ত্বের আলোকে বিদ্রোহী রবীন্দ্রনাথকে রবীন্দ্র প্রতিভার সামগ্রিক বিশ্লেষণ বলে স্বীকার করতে সংকোচ হয়। রিয়ালিস্ট রবীন্দ্রনাথও কবির আশীর্বাদ পেয়েছে। এই গ্রন্থে দুইবোন, মালঞ্চ, বাঁশরী, চার অধ্যায় এবং শেষের কবিতাকে মোটামুটি ভাবে ফ্রয়েডীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করার চেষ্টা করা হয়েছে। খুবই স্বাভাবিক ও সঙ্গত কারণে এই বিচারও অসম্পূর্ণ। কিন্তু যতদূর মনে হয় সে দিন এই জাতীয় বিচার বিশ্লেষণের আগ্রহ ছিল একটা বিরাট স্পর্ধার বিষয়। শ্রী চট্টোপাধ্যায় যে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন আজও তা অসম্পূর্ণ রয়ে গেল। কারণ রবীন্দ্রনাথের আলোচিত গ্রন্থকটির মনস্তাত্ত্বিক বিচার আজও সম্পূর্ণ হয়নি। তাই শ্রীচট্টোপাধ্যায়ের চেষ্টা এখনও বরণীয়।

অথ নট ঘটিত ॥ সূত্রধার। বসুধারা প্রকাশনী। তিন টাকা পঞ্চাশ ন. প. ॥ সহজ ও মিষ্টি করে বাংলা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাস বিবৃত করতে চেয়েছেন সূত্রধার। ইতিহাসকে ইতিহাস রেখেও সহজ ও মিষ্টি অর্থাৎ 'রম্য' করে তোলা যায়। দেশ-বিদেশে এ ধরনের গ্রন্থের অভাব নেই। সেখানে ইতিহাস তার সমস্ত

অর্থ ও তাৎপর্য নিয়ে বিরাজমান। কিন্তু অথ নট ঘটিত গ্রন্থে সূত্রধার বাংলা রঙ্গমঞ্চের জটিল বিকাশপদ্ধতিকে ঐতিহাসিকের চোখ দিয়ে না দেখে কথকের দৃষ্টিতে দেখার চেষ্টা করেছেন বলে এই গ্রন্থ যতটা জন-মন-রঞ্জক ঠিক ততখানি গুরুত্বপূর্ণ নয়। তবে ঘটনাগুলি নির্ভুল হবার জন্য ও রচনাগুণে এই গ্রন্থ এক ধরনের পাঠকদের তৃপ্তি দেবে বলে আশা করা যায়।

জ্যোতির্ময় বসু

স্ফুলিঙ্গ ॥ বার্ণিক রায়। কবিপত্র প্রকাশনী। দু টাকা পঁচাত্তর ন. প. ॥
যবনিকা ॥ নীরেন ভঞ্জ। ভবানীপুর বুক ব্যুরো। আড়াই টাকা ॥
অতলান্ত ॥ প্রণব বসু। গ্রন্থজগৎ। দেড় টাকা ॥

উনিশ শো চুয়াল্লিশের পূর্বে অধিকাংশ বাংলা নাটকই রচিত হয় পেশাদার থিয়েটারের ব্যবসায়িক প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য। চুয়াল্লিশ সালের 'নবান্ন' থেকে বাংলার নবনাট্য আন্দোলনের শুরু। আর এই নবনাট্য আন্দোলন বাংলা নাটককে শুধু যে উল্লিখিত সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্তি দিয়েছে তা নয়, তাকে জীবনমুখীও করে তুলেছে। এই ধারায় অনুপ্রাণিত কিছু নাট্যকার তাই দর্শকদের চিত্তবিনোদনকেই একমাত্র কর্তব্য বলে গ্রহণ করেন নি, নাটকের মাধ্যমে আধুনিক জীবনের নানা জটিল প্রশ্নের গ্রন্থি উন্মোচনের দায়িত্বও নিয়েছেন। স্ফুলিঙ্গ-গ্রন্থে সংকলিত সাতটি নাটিকার রচয়িতা শ্রীবার্ণিক রায়ের নাট্যরচনায় সেই দায়িত্ব গ্রহণেরই আভাস পাওয়া যায়।

কিন্তু ঐ আভাসমাত্রই পাওয়া গেল। নাটকের স্বনির্ধারিত সংজ্ঞার কৃত্রিমতা তাঁর প্রত্যেকটি নাটিকার পূর্ণবিকাশের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। 'নিবেদন'-এ তিনি বলেছেন, নাটক সম্বন্ধে তাঁর মনে এক বিশ্বাস রয়েছে। "মানুষ নিজেকে প্রকাশ করবার সহজাত ইচ্ছাতেই নাটক সৃষ্টি করে না। আসলে তার মনে একটি নাটকীয় ইন্‌স্টিংক্ট রয়েছে। সেই অজানিত নাটকীয় সত্তাটিই বাইরের সমাজের ঘাতপ্রতিঘাতে নাটকের রূপ ধারণ করে।" কিন্তু একদিকে মানুষের মন আর সেই মনের যে কোনো ইন্‌স্টিংক্ট, অন্যদিকে সমাজ—এই দুই দিকের কোনোটিই স্বাধীন স্বতন্ত্র নয়, পরস্পর নির্ভর। তাই ইন্‌স্টিংক্টের উপর সমাজের যে কাজ, সে কাজ ইন্‌স্টিংক্ট-নিরেপক্ষ নয়। পরস্পরের দ্বারা প্রভাবান্বিত হওয়ার ফলে দুই পক্ষেরই আপেক্ষিক অবস্থার পরিবর্তন হয় এবং প্রত্যেক পক্ষ অপর পক্ষকে পরিবর্তিত রূপ দান

করে। একাধারে স্রষ্টা ও সৃষ্টি এই দুই পক্ষের পরিবর্তনের ও পরিবর্তিত রূপের আপেক্ষিক অবস্থার পার্থক্য কোনো নির্দিষ্ট কাল পরিমাণে বিধৃত হয়ে নাটকের সৃষ্টি করে।

উইল-কে ব্যতিক্রম বলে ধরে নিলে বলা যায়, প্রত্যেকটি নাটিকাতেই শ্রীবার্ণিক রায় তাঁর স্বনির্ধারিত সংজ্ঞাকে অক্ষরে অক্ষরে অনুসরণ করার চেষ্টা করেছেন। সেদিক থেকে তিনি নিষ্ঠাবান। কিন্তু সংজ্ঞার কৃত্রিমতার ফলে অধিকাংশ চরিত্রই কৃত্রিমতাদোষ মুক্ত হয়ে স্বাভাবিক হয়ে উঠতে পারে নি। পেণ্ডুলাম নাটিকার মিত্রা তার সমস্ত দুঃখ নিয়ে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন, মাস্টারমশাই মিত্রাকে পরবর্তী সংলাপে এগিয়ে দেবার সূত্র হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছেন। ক্ষণিকের আবির্ভাবে অনীতা শুধুমাত্র এক বিচ্ছিন্ন উত্তেজনার প্রতিমূর্তি। আর সময় সমস্ত কিছু থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে পাখির খাঁচার দোলন-গতির মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে। আগার এ ধূপ না পোড়ালে নাটিকার অনন্ত চরিত্র তার সংশয় নিয়ে, অনীতা ও অজিত তাদের উচ্ছৃঙ্খলতা নিয়ে নাটকীয় সংসক্তিবিহীন ভিন্ন ভিন্ন আলোচনা কক্ষে উপস্থিত। তাই স্ফুলিঙ্গ নাটিকার অমিত তার জ্ঞান, শিক্ষা, দীক্ষা সমস্ত কিছু নিয়েও কৃত্রিমভাবে অসহায় হয়ে আত্মহত্যায় নিঃশেষ হয়ে যায়। নীল রক্ত নাটিকায় অমিত তার প্রেমের বিফলতা নিয়ে, অন্ত তার পরিবেশ-বিচ্ছিন্নতা নিয়ে মীনাকে কেন্দ্র করে পরস্পরের প্রতি কৃত্রিম ও অস্বাভাবিক ভাবে হিংস্র। মা নাটিকায় শমিকের বিচ্ছিন্ন স্বগতোক্তি মা বা বোনের চরিত্রমানস-উদ্ভূত আলোচনা-কক্ষের সঙ্গে সংঘাত-সম্পর্কে প্রতিষ্ঠিত নয়। অথচ বাঁধ নাটিকায় অমিত-বুলবুলির ক্ষেত্রে রচয়িতা অংশত সফল। কারণ কিছু কিছু অংশে চরিত্র দুটি তাদের নিজ নিজ দুঃখের পরিমণ্ডলের মধ্যে থেকেও পরস্পরের সঙ্গে নাটকীয় সংসক্তির দ্বারা সংযুক্ত। প্রত্যেকটি নাটিকার নাট্যনির্দেশের মধ্যে রচয়িতার থিয়েটার সম্পর্কে ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার অভাবের পরিচয়ই প্রকট। অথচ প্রত্যেকটি নাটিকাতেই জীবনমুখী প্রশ্ন করার চেষ্টা শ্রীবার্ণিক রায় করেছেন—যদিও সে সমস্ত প্রশ্ন সুগঠিত নয়। গদ্যে রচিত হয়েও কিছু কিছু অংশের কাব্যময়তায় রচয়িতার ক্ষমতার পরিচয়ই পাওয়া যায়। তাই উল্লিখিত সমস্ত ত্রুটি সত্ত্বেও, নাটক ও থিয়েটার-ভাবের আনুপাতিক সমন্বয়ের উপস্থিতি বার্ণিক রায়ের ভবিষ্যৎ নাট্যরচনাকে সার্থক করে তুলবে বলেই মনে হয়।

শ্রীনীরেন ভঞ্জের যবনিকা চারটি একাঙ্কিকার সংকলন। নাটিকা চারিটির নাম যবনিকা, অমীমাংসিত, ত্রয়ী ও সকলি গরল ভেল। যবনিকা নাটিকায় সুললিত ও নিরঞ্জনের মধ্যে প্রেমের ত্রিভুজের তৃতীয় বাহুস্বরূপ অলকার উপস্থিতি। অলকা চরিত্রের আলোচনা কক্ষ সুললিতের সঙ্গে স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কে এবং নিরঞ্জনের সঙ্গে গোপন প্রেমের সম্পর্কে প্রতিষ্ঠিত। একই আলোচনা-কক্ষের দুই বিপরীত অংশের সংঘাতের মাধ্যমে নাটিকা পরিণতির দিকে অগ্রসর হয় এবং শেষ পর্যন্ত অলকা সুললিতের সঙ্গে আপাত-স্বাভাবিক সম্পর্কে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। মনোরম বিন্যাসের ফলে নাট্যকৌতূহল সর্বত্রই সমান। কিন্তু শেষের সম্পর্কের আপাত-স্বাভাবিকতা নাটিকাটির বাস্তবতা সম্পর্কে মনকে সংশয়ান্বিত করে তোলে। ত্রয়ী নাটিকা কিন্তু এই ত্রুটি থেকে আংশিকভাবে মুক্ত। অতনুকে কেন্দ্র করে নীপার ও সুলতার প্রেমের দ্বন্দ্ব এবং পরিণতিতে নীপার প্রেম আপন মহত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত। পরিণতি স্বাভাবিক হলেও নীপা চরিত্রের আলোচনা-কক্ষে পরিমিত পরিসরের অভাব। অতনু চরিত্র কোনো মুহূর্তেই সূত্রধারের ভূমিকা থেকে চরিত্রের পর্যায়ে উন্নীত নয়। সকলি গরল ভেল কৌতুক নাটিকা। কৌতুককর পরিস্থিতি সৃষ্টিতে ও কৌতুকবহ সংলাপ রচনায় নাট্যকার দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। অমীমাংসিত নাটিকার ঘটনাস্থল এক রেস্তোরাঁ, আর চরিত্র বলতে সেই রেস্তোরাঁর কিছু খরিদ্দার। কেন্দ্রীয় চরিত্র বিনয় সম্পর্কে নানা কাহিনী। এই সমস্ত কাহিনীর সমন্বয়ে চরিত্র সম্পর্কে একটি মীমাংসায় হয়তো আসা যায়; কিন্তু প্রায় শেষ মুহূর্তে এক ভদ্রমহিলার আবির্ভাব চরিত্রটিকে পুনরায় অমীমাংসিতের পর্যায়ভুক্ত করে তোলে। কিন্তু নাটিকাটিতে ঘটনা ঘটাবার প্রয়োজনেই যেন চরিত্রদের উপস্থিতি। এর ফলে কোনো চরিত্রই সংলাপের মাধ্যমে স্বাভাবিক হয়ে ওঠে নি। প্রত্যেকটি চরিত্র সংলাপের বাহক হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। অথচ শ্রীনীরেন ভঞ্জ সংলাপকে যদি চরিত্রমানসের প্রকাশ-মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করতে পারতেন, তবে নাটিকাটি সার্থক হয়ে উঠত।

প্রণব বসুর অতলান্ত নাটিকার অনাদিবাবুর স্ত্রীর মৃত্যুকে সত্য বলে স্বীকার করে নেবার সাহসের অভাব ছিল। তাই নিজেকে তিনি—স্ত্রীর মৃত্যু হয় নি—এই মিথ্যা মোহের বশবর্তী করে নিয়েছিলেন। মিথ্যা ধারণা করে নিয়েছিলেন যে পুত্র কল্যাণের সঙ্গে কণিকার বিবাহে তাঁর স্ত্রীর সম্মতি

নেই। অথচ তাঁর এই সব ধারণার কোনো কারণ দেখানো হয় নি। নাটক তৈরি করার প্রয়োজনে তাঁকে দিয়ে ধারণা করিয়ে নেওয়া হয়েছে মাত্র। কল্যাণ বা কণিকা কেউই মিথ্যা ধারণা দূর করে দেওয়ার কোনো চেষ্টাই করে নি। এমন কি ডাক্তারও নয়। অথচ এদের প্রচেষ্টাকে কেন্দ্র করে সুন্দর একটি নাটক রচিত হতে পারত। কল্যাণ, কণিকা ও ডাক্তার তিনজনেই অনাদিবাবুর অসুস্থ কল্পনাকে প্রশ্রয় দিয়ে গেছেন অনাদিবাবুর 'করোনারি অ্যাটাকে' মৃত্যুর মতো অতিনাটকীয় পরিণতিকে মঞ্চে উপস্থিত করার জন্য, অনাদিবাবুকে দীর্ঘায়ু করার জন্য নয়। কোনো চরিত্রই যুক্তিসঙ্গত পরিবেশ নিয়ে নাটিকায় উপস্থিত নয়। বত্রিশ পৃষ্ঠার এই ক্ষুদ্র নাটিকা পাঁচটি দৃশ্যে বিভক্ত। এক দৃশ্য আপন গতিতে পরবর্তী দৃশ্যের সূত্রপাত করে নি। পরিণতির কথা ভেবে প্রত্যেকটি দৃশ্যকে বিচ্ছিন্নভাবে কল্পনা করা হয়েছে। সংলাপও অভিনয়বহ নয়। প্রণব বসুর ভবিষ্যৎ সার্থক নাট্যরচনা ও একনিষ্ঠ নাট্যানুশীলনের অপেক্ষা রাখে বলেই মনে হয়।

অজিত গঙ্গোপাধ্যায়

কাঞ্চনরঙ্গ॥ শম্ভু মিত্র ও অমিত মৈত্র। গ্রন্থপীঠ। আড়াই টাকা॥

নাটকটির প্রথম দিকে সংস্কৃত নাটকের প্রস্তাবনা রীতি গৃহীত হয়েছে। সূত্রধার ও নটী তাদের সহজ হাস্য পরিহাসিকতার মধ্য দিয়ে প্রস্তাবনায় নাটকীয় কাহিনীর চুম্বক বলে দিয়েছে। তাদের বলার সঙ্গে সঙ্গেই নাটকের অভিনয় শুরু হয়ে গেছে। বর্তমান নাটকে এই আঙ্গিক কতখানি অনুসরণযোগ্য, ঐতিহ্যের দাবি এক্ষেত্রে শুধু আঙ্গিক-চর্চায় পর্যবসিত কিনা—এ প্রশ্ন অবশ্য থেকেই যায়।

নাটকে মূল প্রতিপাদ্য হলো এই যে, টাকা না থাকলে মানুষকে ঘৃণা করা হয়, টাকা পেলে সেই ভর্ৎসিত বা ঘৃণিত মানুষই সমাজের উচ্চ প্রাঙ্গণে আদৃত হয়। নাটকের নায়ক চরিত্র পাঁচুর জীবনকে কেন্দ্র করে এই কাহিনী বিবৃত হয়েছে। তবে, নাটকটিতে কোনো ব্যাপক ও গভীর জীবন জিজ্ঞাসার সম্মুখীন হতে হয় না।

নাটকটি কমেডি বলেই লটারির টিকিটের ভুল নম্বর টেলিগ্রাম মারফৎ সংশোধিত হয়ে এসেছে। কিন্তু শিল্পচৈতন্যের দিক থেকে ও

বাস্তবতার দাবিতে নাটকটির শেষ হওয়া উচিত ছিল সেখানে—যেখানে পাঁচু টাকা পাওয়া ও না-পাওয়ার সংবাদের বিভিন্ন অভিজ্ঞতায় নিজের আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে একাকী জীবনসংগ্রামে অগ্রসর হতে প্রস্তুত হয়েছে। লটারির টাকা পাওয়া আর জুয়ো খেলে টাকা পাওয়া একই। সুতরাং লটারির টাকা পাওয়ার সংবাদে ভালো মানুষের কাছে ভগবানের নিরপেক্ষ ন্যায়-নীতির করুণা কল্পনা মানবিক সত্যকে অস্বীকার করে। ফলে কাঞ্চন-রঙ্গের রঙ্গ শেষ পর্যন্ত রঙ্গেই নিঃশেষিত।

চরিত্রসৃষ্টি অধিকাংশই টাইপে পর্যবসিত। এক অর্থবৃত্তকে কেন্দ্র করে সকলের চরিত্র চিত্রিত হয়েছে। সর্বোপরি বলা যায়, সামান্য মানব রসের জারক মিশিয়ে ঘটনামূলক নিছক হালকা কমেডি রচনাই কাঞ্চনরঙ্গের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। নাটকীয় চরিত্রের ঘাতপ্রতিঘাতে ও চারিত্রিক অসংলগ্নতায় যে স্বতঃস্ফূর্ত হাসির উচ্ছ্বাস—তা এখানে নেই। অভিনয়ের সাফল্য, সাহিত্য-রসাস্বাদনের সঙ্গে অনিবার্যভাবে যুক্ত নয়—কাঞ্চনরঙ্গে এ কথা আবার প্রমাণিত হলো।

বার্ণিক রায়

বিয়োগপঞ্জী

রিচার্ড হেনরি টনি (Tawney) রাজনৈতিক নেতা ছিলেন না, অভিনেতাও না—ব্রিটিশ লেবার পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ থাকলেও তিনি প্রধানত ছিলেন সমাজবিজ্ঞানী ও শিক্ষক। স্বভাবতই তাঁর মৃত্যু সংবাদ (লণ্ডন, ১৬ই জানুয়ারি) এদেশের সংবাদপত্রে উপেক্ষিত হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও স্বীকার করতেই হয় এদেশের সমাজবাদী আন্দোলনে টনির প্রভাব উপেক্ষণীয় নয়। ত্রিশের যুগে এদেশের বুদ্ধিজীবীরা—যাঁরা সমাজবাদকে বরণ করেছেন—তাঁরা অনেকেই টনির কাছে নানানভাবে ঋণী।

পঁচিশ-তিরিশ বছর আগেকার কথা—আজ সে-সব দিন আরো দূর মনে হয়—মার্কস এঙ্গেলস লেনিন-এর বই তখন এদেশে সুলভ ছিল না। ছ'পেনি দামের পেঙ্গুইন সংস্করণে টনির 'রিলিজিয়ন অ্যাণ্ড রাইজ অব ক্যাপিটালিজম' পড়ে অনেকেই তখন ধর্মের অহিফেনের প্রকৃতি সম্পর্কে সচেতন হয়েছিলেন। তাঁর 'ইকুয়ালিটি' ও 'অ্যাকুইজিটিভ' সোসাইটিও হয়তো অনেককেই সামাজিক অসাম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অনুপ্রাণিত করেছে।

টনির সঙ্গে আত্মীয়তা বোধ করবার অবশ্য অন্য কারণও আছে। টনি জন্মেছিলেন এই কলকাতা শহরেই, ১৮৮০ সালে। তাঁর বাবা সি. এইচ. টনি ছিলেন কলকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষ। কিন্তু সেটা গৌণ কারণ। কেননা, কলকাতায় জন্মালেও ভারতবর্ষের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল সামান্যই। ল্যাস্কির মতো টনির সঙ্গেও আমাদের যোগাযোগটা মোটের উপর আত্মিক—যদিও এমন ব্যক্তিও হয়ত দু-একজন পাওয়া যাবে যাঁরা লণ্ডন স্কুল অব ইকনমিক্স বা লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে মিশবার সুযোগ পেয়েছেন।

অবশ্য টনির সঙ্গে আমাদের মতের মিল যতটুকু, অমিল তার থেকে কম নয়। টনি ছিলেন নিয়মতান্ত্রিক সমাজবাদী। বিপ্লবী পন্থায় তাঁর আস্থা ছিল না। তিনি মনে করতেন ভালো মানুষেরাই ভালো সমাজ গড়তে পারে—শুধু অর্থনৈতিক ক্ষমতার হস্তান্তর হলেই ভালো সমাজ, সমাজবাদী সমাজ গড়ে উঠবে না। এ যুক্তির মধ্যে সত্য হয়তো কিছু আছে—আজ সমাজবাদীরা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে কাল থেকেই দেশে সত্যযুগ প্রতিষ্ঠিত হবে এমন

অবাস্তব ধারণা আজ আর নিশ্চয়ই কেউ পোষণ করেন না। সমাজতান্ত্রিক মূল্যবোধ সাধারণ মানুষের মধ্যে চারিয়ে যেতে সময় লাগে। এই সময়টা এমন কি চল্লিশ-পঞ্চাশ বছরও হতে পারে। প্রবাদই আছে অভ্যাস যায় না মলে! কিন্তু কথা হচ্ছে অর্থনৈতিক ক্ষমতার হস্তান্তর ব্যাতিরেকে কি এই পরিবর্তন সম্ভব? অন্তত আজ পর্যন্ত ইতিহাসে তার কোনো ইতিবাচক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না।

টনি অবশ্য অর্থনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করতেন না—কিন্তু তিনি মনে করতেন নিয়মতান্ত্রিক পথেই সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা হবে। বিপ্লবী পন্থার বিরুদ্ধে তাঁর যুক্তি ছিল এই যে "Men donot burn down the house which they intend to occupy, even though they regard its existing tenant as public nuisence." (Equality. p. 99) এই যুক্তির গলদ স্পষ্ট। বাড়ি ভেঙে না ফেললেও পূর্বতন পাজী মালিক ফের যাতে বাড়ির দখল নিতে না পারে লোকে নিশ্চয়ই তার ব্যবস্থা করে। দ্বিতীয়ত, বাড়িটাকে নিশ্চয়ই সংস্কার করে নিজেদের ব্যবহারোপযোগী করে নেয়। তথাকথিত নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতি এই দিক থেকেই ব্যর্থ। বাড়ির পুরনো মালিকদের ক্ষমতায় পুনর্বার আরোহনের পথ তা বন্ধ করতে পারে না। লেবর পার্টি পাঁচ বছরে যদি কোনো কল্যাণমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করে, কনজারভেটিভ পার্টি ক্ষমতায় ফিরে এসে অনায়াসে তা বাতিল করে দিতে পারে। এরকম দৃষ্টান্ত ইংলণ্ডের সাম্প্রতিক ইতিহাসেই যথেষ্ট পাওয়া যাবে। দ্বিতীয়ত, নিয়মতান্ত্রিক সমাজবাদী দলগুলোর মধ্যে বাড়িটা সংস্কারের আগ্রহেরও অভাব দেখা যায়। বিলেতের লেবর পার্টি একাধিকবার গভর্ণমেণ্ট গঠন করছে কিন্তু পুঁজির ক্ষমতাকে চূর্ণ করবার কোনো প্রয়াসই তারা করে নি। কাণ্ড দেখে ফেবিয়ানদের খপ্পরে-পড়া ভালো মানুষ বার্ণার্ড শ-কেও বলতে হয়েছে সেলাইয়ের কল যদি বা ডিম প্রসব করতে পারে—বিলেতের লেবর পার্টি সমাজবাদ কখনও প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না!

অবশ্য অবস্থা বিশেষে নির্বাচন মারফতেই সমাজবাদী কি সাম্যবাদী দল হয়তো সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতে পারে আর সেই নির্বাচনী বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে যদি জনজাগরণের তরঙ্গ এতটা উত্তাল হয়ে ওঠে, যার ফলে পুঁজিতন্ত্রের প্রতিরোধ ক্ষমতাই আর থাকবে না সে ক্ষেত্রে হয়তো পার্লামেণ্টে বিল পাশ করেই সমাজবাদী ব্যবস্থা কায়েম করা সম্ভব। কিন্তু বিনা রক্তপাতে বা

পার্লামেণ্টে বিল পাশ করে হলেও একে নিয়মতান্ত্রিক পথ বলা সঙ্গত নয়। এটাও বিপ্লবী পন্থাই। রক্তপাত বা গৃহযুদ্ধ আর বিপ্লব সমার্থক শব্দ নয়। রক্তপাত বা গৃহযুদ্ধ মারফৎ ফাশিস্তরাও ক্ষমতা দখল করে কিন্তু তাকে কেউ নিশ্চয়ই বিপ্লব বলবে না। বিপ্লব বলতে বোঝায় বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার বদলে এক উন্নততর সমাজব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করা। অর্থাৎ কি ভাবে ক্ষমতা দখল করা হল সেইটে বড় কথা নয়, ক্ষমতা দখলের পর কি করা হল সেইটেই বড় কথা। লেবার পার্টি নির্বাচনে জিতে যদি উৎপাদন ব্যবস্থা জাতীয়করণ করত, যদি সুবিধাভোগী শ্রেণীর বিলোপ ঘটাত, যদি সমাজবাদী বণ্টন ব্যবস্থার প্রবর্তন করত অর্থাৎ পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বদলে সমাজবাদী ব্যবস্থার প্রবর্তন করত তাহলে কেউই তার সমালোচনা করত না। কিন্তু লেবর পার্টি তা করে নি। লেবার রাজত্বের পরও সামাজিক অসাম্য বিলেতে তেমনই আছে। আছে যে 'ইক্যুয়ালিটি'র সংশোধিত সংস্করণে টনিই তা দেখিয়েছেন।

কিন্তু পথের ব্যাপারে টনির সঙ্গে আমাদের মতের অমিল থাকলেও একথা অবশ্যই স্বীকার করে সামাজিক অসাম্য সম্পর্কে তার বিরাগ ছিল আন্তরিক। তিনি তার নিজের মত করে সামাজিক অসাম্যের বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রামও করেছেন। বিশেষ করে যে শিক্ষা ব্যবস্থা সামাজিক অসাম্যকে বাঁচিয়ে রাখে তার বিরুদ্ধে, the···school for the well-to-do পাবলিক স্কুল ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাঁর আজীবন সংগ্রাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণযোগ্য। তাঁর বইগুলি থেকেও সমাজবাদী আন্দোলন দ.র্ঘকাল পরে অনেক শাণিত অস্ত্র।

প্রদ্যোৎ গুহ

বিয়োগপঞ্জী

অমরেন্দ্র ঘোষের জীবনাবসান হয়েছে।

অল্প বয়েসে 'কল্লোল' পত্রিকায় তিনি একটি গল্প লেখেন। তারপর সুদীর্ঘকাল প্রায় অজ্ঞাতবাসে কাটিয়েছেন। সাহিত্যে সহজ সাফল্যের নেশা পরিহার করে, 'কল্লোল'-কালীন সাহিত্যিক সৌখিনতার আবহাওয়া থেকে দূরে বাসা বেঁধে তিনি নিজেকে ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত করেছিলেন। বরিশালের মানুষ। তাঁর মতো পূর্ববঙ্গের নদী-মাটি ও জীবনের এমন ব্যাপক পুংখানুপুংখ পরিচয় বহন করে অল্প লেখকই বাংলা সাহিত্যের আসরে অবতীর্ণ হয়েছেন। দেশ বিভাগের পর অমরেন্দ্র ঘোষ প্রবীণ বয়েসে কলকাতায়

আসেন। টালিগঞ্জের একটি ব্যারাকবাড়ির একটিমাত্র টিনের ঘরে সপরিবারে তাঁর দিন কেটেছে। ঐ ঘরেই তিনি সাহিত্য সাধনার দীপ জেলেছিলেন। ঐ ঘরেই তাঁর জীবনদীপ নির্বাপিত হল।

কিছুকাল একটি রেশনের দোকানে সামান্য চাকরি করেছিলেন। তারপর সে কাজটিও গেল। ভগ্নস্বাস্থ্য, দুরারোগ্য ব্যাধি, অনিশ্চয়তা ও অপরিসীম অর্থকষ্ট—এই ছিল তাঁর চোদ্দ-পনেরো বছরের শহরবাসের ইতিকথা। কিন্তু অমরেন্দ্র ঘোষ হার মানেন নি। আপন জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি এক আশ্চর্য বিশ্বাস ও ইতিহাসচেতনা লাভ করেছিলেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি এই বিশ্বাসকে আঁকড়ে মাথা উঁচু করে বেঁচেছেন। বাংলা সাহিত্যের যে পর্বটি চরিত্রহীনতার কলঙ্কে মসীলিপ্ত, সেই পর্বে যে দু-একজন চরিত্র বজায় রেখেছেন, অমরেন্দ্র ঘোষ ছিলেন তাঁদের অন্যতম।

'চরকাশেম' প্রকাশিত হওয়ার পর অমরেন্দ্র ঘোষ রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে ওঠেন। একটিমাত্র উপন্যাস লিখে এমন খ্যাতি অল্প লেখকই পেয়েছেন। তারপর ক্রমাগত তিনি উপন্যাস লিখে গেলেন। অর্থের প্রয়োজনে সাধ্যের অতিরিক্ত লেখা লিখলেন। তদুপরি ছিল ভগ্নস্বাস্থ্য। ছিল অনিশ্চয়তা। লেখাগুলিতে তার ছাপ পড়ল।

লেখক হিসেবে অমরেন্দ্র ঘোষ ছিলেন উচ্চাকাঙ্ক্ষী। 'দক্ষিণের বিল' 'জোটের মহল' তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষী প্রয়াস। তাছাড়া তিনি ছিলেন প্রবল মাত্রায় উদ্দেশ্যবাদী। যেন নিজের দর্শন প্রচারের জন্যই তিনি কাহিনী বেছে নিতেন। কিন্তু তাঁর সেই অমোঘ প্রতিভা ছিল না যার প্রকাশ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ে সহজলক্ষ্য। ফলে অমরেন্দ্র ঘোষের অধিকাংশ রচনায়ই দেখি সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত অথচ সৃষ্টি কর্ম যেন অসম্পূর্ণ। এই অসম্পূর্ণতাকে সম্পূর্ণ করার সময় ও সুযোগ তিনি পান নি।

ফলে জীবিতকালেই অমরেন্দ্র ঘোষ খ্যাতির উচ্চচূড়া থেকে বিস্মৃতির অন্ধকারে হারিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁর সেই ব্যাপ্ত ও গভীর অভিজ্ঞতাকে খানিকটা মধ্যবিত্তসুলভ রঙীন পোষাক পরান নি বলে, তাঁর সেই উচ্চ কণ্ঠ শ্রেণীচেতনাকে প্রতি মুহূর্তে সঙীনের মতো উদ্যত রেখেছেন বলে সাহিত্যের মুরুব্বীশ্রেণীও তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় ক্ষান্তি দিয়েছিলেন। জনপ্রিয়তার মোহে এক বিশেষ ধরনের সাধারণ পাঠকের মনোরঞ্জন করতেও তিনি চান নি। তাই শেষ জীবনে তিনি ছিলেন একা। কিন্তু এই নতুনতর

ব্যর্থতার মধ্যেও অমরেন্দ্র ঘোষ হার মানলেন না। শেষের দিকে নগরজীবনের অভিজ্ঞতাও তাঁর রচনায় এসেছিল। কিন্তু গ্রামের মতো নগরের চরিত্র উদ্ঘাটনে পারদর্শিতা তাঁর ছিল না।

ইতিহাস আর মানুষে ছিল তাঁর অপরিসীম বিশ্বাস। বারবার তাঁর অনুরাগী দেশবাসী তাঁদের সহৃদয়তা ও আন্তরিকতা নিয়ে নিঃস্ব সাহিত্যিকের ত্রাণে ছুটে এসেছেন। বারবার অমরেন্দ্র ঘোষ এইভাবে নতুনতর বিশ্বাসে বেঁচে উঠেছেন। মৃত্যুর পূর্বে তাঁর এই কঠোর জীবনসংগ্রাম ও আশ্চর্য কিছু অভিজ্ঞতার কাহিনী তিনি 'জবানবন্দী' নামে লিখে গেছেন। এটি আজও অপ্রকাশিত।

শেষ দিকে অমরেন্দ্র ঘোষ এক নতুনতর নিরীক্ষার পথে পা দিয়েছিলেন। 'নাগিনী মুদ্রা' উপন্যাসটি ও আরও কিছু রচনায় লেখকের এই বিকাশোন্মুখ মনের পরিচয় পাই। কিন্তু এ পথ তাঁর অভ্যস্ত পথ ছিল না। জানি না সময় পেলে অমরেন্দ্র ঘোষ এই নতুন আঙ্গিকে কোনো নবতর চরের কথা লিখতেন কিনা।

কিন্তু সমস্ত অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও বিষয় মহিমায়, বিশেষ রচনা গুণে ও বক্তব্যের দৃঢ়তায় তিনি স্মরণযোগ্য।

হায় ছায়াবৃতা

এক বছর আগে ঔপনিবেশিকতাবাদী ঘাতকদের হাতে প্যাট্রিস লুমুম্বা নিহত হয়েছিলেন। সমস্ত পৃথিবীর শুভবুদ্ধি ও বিবেক আর্তনাদ করে উঠেছিল। কৃষ্ণমহাদেশের এক জননায়ক বলেছিলেন লুমুম্বার মৃত্যুতে গোটা আফ্রিকার লাঞ্ছনা।

এক বছরেও কঙ্গো-সমস্যার সমাধান হয় নি। সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতির বশম্বদ মোড়ার রাষ্ট্রসংঘ নির্লজ্জ চাতুরিতে একের পর এক দিন গ্রহণ করে ক্রমাগত সময় অপহরণ করছে। আর সুবিশাল কঙ্গোভূমিতে ষড়যন্ত্র, লুণ্ঠন ও বিভেদ অব্যাহত।

লুমুম্বার রাজনৈতিক অনুগামী গিজেঙ্গা বন্দী হয়েছেন। এই বিশাল রাষ্ট্রের নির্বাচিত মন্ত্রীসভার সহকারী প্রধানমন্ত্রীকে একটি খাঁচায় পুরে রাখা হয়েছে। লুমুম্বার মতোই তাঁকে ঘিরেও নানা গুজব। হায়! মুক্তি ও বিকাশের জন্য এই কৃষ্ণভূমিতে আর কত রক্ত অঞ্জলি দিতে হবে?

সার্থক জনম আমার

পদ্মা ও মেঘনায় জোয়ার এসেছে। ফিল্ড মার্শাল আয়ুব খাঁর দীর্ঘ শ্বাসরোধকারী মিলিটারী শাসনের বিরুদ্ধে ঢাকার ছাত্রসমাজ বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন।

কুখ্যাত মুসলিম লীগ মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে এই ছাত্রসমাজই একদিন ভাষার দাবিতে ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন। ঘৃণ্য মিলিটারী শাসনের বিরুদ্ধে আজ তাঁরা স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের দাবিতে আবার পথে নেমেছেন।

সরকারী সেনশারব্যবস্থার প্রকোপে পূর্ববঙ্গের কোনো খবর সহজে বাইরে আসছে না। কিন্তু একথা ধ্রুব বুঝেছি, পাকিস্তানের রহস্যময় রাজনীতিতে আরও এক পটপরিবর্তন আসন্ন।

শেষ সংবাদ

: আন্তঃ আমেরিকান সংস্থা থেকে কিউবার বহিষ্কার প্রস্তাব অনুমোদন করাতে গিয়ে দেখা গেল দক্ষিণ আমেরিকায় মার্কিনী পররাষ্ট্রনীতি এক গভীর সংকটের সম্মুখীন।

: পশ্চিম ইরিয়ানে ডাচ সাম্রাজ্যবাদীদের অভিভাবকত্বকালে এশিয়ায় মার্কিনী পররাষ্ট্রনীতি নতুন সমস্যা সৃষ্টি করেছে।

: সিংহলে সামরিক অভ্যুত্থানের প্রয়াস ব্যর্থ।

: ফ্রান্সে আলজিরিয়ার প্রশ্নে ফাশিস্ত এস. এস. ও. সংগঠনের বিরুদ্ধে কমিউনিস্ট নেতৃত্বে দেশবাসীর অভ্যুত্থান সম্ভবত ইওরোপেও এক নতুন জাগরণ ডেকে আনছে।

: গোয়ার ব্যাপারে পর্তুগাল ক্রুদ্ধ, ইঙ্গ-মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদীরা ক্ষুব্ধ।

: আফ্রিকা অশান্ত।

: বার্লিন।

সমস্ত পৃথিবীতে নাটো জোটের নেতা হিটলারের ভূতপূর্ব সহকারী হয়সিঙ্গারের বিচার দাবি।

মাত্র কয়েকদিনে পৃথিবীর রাজনৈতিক আকাশে এই অষ্টগ্রহের সমাবেশ ব্রহ্মাণ্ডের শান্ত সমৃদ্ধির অভিভাবক প্রেঃ কেনেডিকে বড়ই বিষণ্ণ করেছে। প্রেঃ অধুনা অধ্যাত্মবাদী, এমন কি ভারতীয় মতে যাগযজ্ঞাদিতেও বিশ্বাসী। তাই বিশ্বাহতায় এতদ্দেশীয় ধর্মযজ্ঞে তাঁর হয়ে আহুতি দেবার জন্য এই মার্চ মাসে প্রচুর আমেরিকান তেল সহ শ্রীমতী জ্যাকেলিন কেনেডী আসছেন।

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

পাঠকদের প্রতি নিবেদন

ফাল্গুন সংখ্যা (মার্চ মাস) থেকে 'পরিচয়' বর্ধিত কলেবরে প্রকাশিত হবে। বর্তমানে 'পরিচয়' ছাপা হয় নিউজপ্রিণ্টে, বিজ্ঞাপনসহ পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিয়ানব্বই। পরবর্তী সংখ্যা থেকে 'পরিচয়' ছাপা হবে এ্যান্টিক কাগজে, বিজ্ঞাপন ছাড়া পৃষ্ঠা সংখ্যা হবে কমপক্ষে একশো আঠাশ পৃষ্ঠা। প্রতি সংখ্যায় অন্তত একটি চিত্রের প্রতিলিপি থাকবে। প্রচ্ছদ নতুন হবে।

*

নিয়মিত বিভাগ

১। বিজ্ঞান। ২। সমসাময়িক সাংস্কৃতিক ঘটনাবলীর ওপর ব্যঙ্গাত্মক রস-রচনা। ৩। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সাংস্কৃতিক ঘটনাবলীর পর্যালোচনা। ৪। চলচ্চিত্র প্রসঙ্গ। ৫। নাট্যপ্রসঙ্গ। ৬। চিত্রপ্রসঙ্গ। ৭। সঙ্গীত প্রসঙ্গ। ৮। সাম্প্রতিক-সাহিত্য। ৯। পুস্তক-পরিচয়। ১০। পত্রিকা-প্রসঙ্গ ইত্যাদি। এবং কয়েক সংখ্যা অন্তর রাজনীতি ও অর্থনীতি প্রসঙ্গে আলোচনা।

*

তাছাড়া

প্রবন্ধ। কবিতা। কাব্যনাট্য। ধারাবাহিক উপন্যাস। একাঙ্কিকা। গল্প। বিদেশী সাহিত্যের অনুবাদ।

দীর্ঘ তিরিশ বছরে বাংলা সাহিত্যে 'পরিচয়' যে ঐতিহ্য তৈরি করেছে, তাকে পরিপূর্ণ বিকাশের পথে অগ্রসর করার জন্য 'পরিচয়' চাইবে একদিকে জনপ্রিয় হতে অন্যদিকে তার বিশেষ প্রগতিশীল ভূমিকাটি পালন করতে। তাই গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্বালোচনার সঙ্গেই প্রকাশিত হবে সহজবোধ্য নিবন্ধ। কিন্তু বলাই বাহুল্য 'পরিচয়'-এ প্রকাশিত কোনো রচনাই তার মূল লক্ষ্য থেকে ভ্রষ্ট হবে না। সাহিত্য ও সংস্কৃতির জগতে ক্রমবর্ধমান প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে 'পরিচয়' যেমন সংগ্রাম করবে, তেমনই সে প্রকাশ করবে যথার্থ শিল্পসৃষ্টির সার্থক নমুনা। পরিপ্রেক্ষিত হিসেবে বিশ্ব-সংস্কৃতিকে গ্রহণ করে সৃষ্টি ও সংগ্রাম—এই দ্বৈত ভূমিকা পালনে 'পরিচয়' আরও একবার তার প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করছে।

ফাল্গুন থেকে প্রতি সংখ্যার মূল্য এক টাকা। বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা : দশ টাকা। ষান্মাষিক গ্রাহক চাঁদা : পাঁচ টাকা পঞ্চাশ ন. প.

পরিচয়

ফাল্গুন ১৩৬৮

